

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নীলমানুষ



*If you want to download
a lot of ebook,
click the below link*



**Get *More*
Free
eBook**

**VISIT
WEBSITE**

www.bengaliboi.com

Click here



নীলমানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



আনন্দ

bengaliboi.com

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪

অলংকরণ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ভারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-391-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

NILMANUSH

[Stories]

by

Sunil Gangopadhyay

Published by

Ananda Publishers Private Limited

45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

মুখবন্ধ

একসময়ে সুনীল এই নীল মানুষ রণজয়কে নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। তারপর কেন জানি না, এই নীল মানুষটিকে সুনীল ভুলে যান। কিশোর পাঠকদের আবার রণজয়ের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য আনন্দ পাবলিশার্স বইটি প্রকাশ করল। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদের জন্য নীল মানুষের পরিচিতিটি লিখেছে আমার স্নেহভাজন তরুণ কবি অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়

সূচি

নীল রঙের মানুষ ১
নীল মানুষের কাহিনি ১৫
নীল মানুষের দুঃখ ২৮
নীল মানুষের দেশে ৪২
ভূতের দেশে নীল মানুষ ৬৩
সেই একলা নীল মানুষ ৭৮
নীল মানুষ ও ছোট্ট বন্ধু ৮৯
নীল মানুষের সংসার ১০৫
নীল মানুষের মন খারাপ ১১৭
নীল মানুষের পরাজয় ১৩০
রণজয়ের শহর-অভিযান ১৪৬
আজব লড়াই ১৬৩
ইচ্ছা গ্রহ ১৭২
নীল মানুষের খেলা ১৮৪
পৃথিবীতে নীল মানুষ ১৯৫

নীল রঙের মানুষ

তখন খুব ভোর। ভালো করে আলো ফোটেনি। একটু একটু অন্ধকার আর একটু একটু আলো মিশে একটা শরবতের মতন রং তৈরি হয়েছে। শুধু আকাশের পূর্ব দিকটা সামান্য লালচে। একটু পরেই সূর্য উঠবে।

রণজয় বিশ্বাস নামে একজন যুবক সেই সময় নদীর ঘাটে গিয়েছিল। রণজয় প্রত্যেকদিনই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর একা একা নদীতে চলে আসে। তার বাড়ি থেকে নদী প্রায় দু'মাইল দূর। রণজয়ের খুব মাছ ধরার শখ। সে সারাদিন তো মাছ ধরেই, রাত্তিরবেলাও নদীতে একটা ছিপ ফেলে রেখে আসে। ভোরবেলা এক একদিন গিয়ে দেখতে পায়, তার বাঁড়শিতে একটা মস্ত বড় মাছ ধরা পড়ে আছে।

সেদিন রণজয় নদীর দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় আকাশে ফট করে একটা শব্দ হল। শব্দটা খুব জোরে নয়, অনেকটা হাউইবাজি ফাটার শব্দের মতন। রণজয় ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, তার ঠিক মাথার ওপরে আকাশে, অনেক উঁচুতে কী যেন একটা জিনিস ফেটে গিয়ে খুব আলো আর আগুন বেরুচ্ছে। জিনিসটা এত উঁচুতে যে কোনও বাজি অতদূর উঠতে পারে না। তা ছাড়া এখন তো কোনও পুজোটুজো নেই, কে আর এখন গ্রামের আকাশে বাজি ফাটাবে!

রণজয় জানে, অনেক সময় আকাশে এরোপ্লেনে আগুন ধরে যায়, তারপর সবসুদ্ধ

ভেঙে পড়ে। প্রায়ই খবরের কাগজে এরকম খবর থাকে। সেইরকমই একটা কিছু হল নাকি? রণজয় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

যদিও খুব উঁচুতে, তবু সেই জিনিসটা ঠিক এরোপ্লেন মনে হয় না। একটা বিরাট গোল জিনিস। ফটফট করে শব্দ হচ্ছে আর সেটার এক একটা টুকরো ভেঙে ভেঙে ছিটকে যাচ্ছে। যদি হঠাৎ একটা টুকরো মাথায় এসে পড়ে, সেই ভয়ে রণজয় দৌড়ে গিয়ে একটা তেঁতুল গাছের নীচে দাঁড়াল। তবু সে ওপরের দিকে না তাকিয়ে পারল না।

এরপর সে আর একটা আরও আশ্চর্য জিনিস দেখল। সেই গোল জিনিসটা যখন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তখন দেখা গেল, সেটা থেকে বেরিয়ে কয়েকজন মানুষ হাওয়ায় ভাসছে। এত দূর থেকে তাদের খুবই ছোট ছোট দেখালেও বোঝা যায়, ওগুলো পাখি নয়।

সেই আকাশযানের জ্বলন্ত টুকরোগুলো ছিটকে কোনটা কোথায় চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই, শুধু একটা টুকরো কামানের গোলার মতন জ্বলতে জ্বলতে এসে পড়ল নদীতে। অনেকখানি জল ছিটকে উঠল আর জায়গাটা এমন ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে গেল যে দু’-এক মিনিটের মধ্যে রণজয় চোখে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর একটু পরিস্কার হতেই দৌড়ে গেল নদীর ধারে। দেখল যে, নদীর মাঝখানে এক জায়গায় জ্বলে খুব ভুড়ভুড়ি কাটছে আর একটা লোক যেন ডুবে যাচ্ছে সেখানে। লোকটার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা হাত বেরিয়ে আছে জলের বাইরে, সেই হাতে কী যেন একটা গোল মতন জিনিস ধরা। আগুনে পুড়ে যাবার জন্যই বোধহয় লোকটার হাতের রং মিশমিশে কালো।

রণজয় খুব ভালো সাঁতার জানে। একজন লোক ডুবে যাচ্ছে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু রণজয় উদ্ধার করতে পারল না লোকটাকে। সাঁতরে নদীর মাঝখানে যাবার আগেই লোকটা ডুবে গেল। নদীটা খুব বড় নয়, কিন্তু জোয়ারের সময় খুব জল থাকে।



কাল রাতেই জোয়ার এসেছে। রণজয় ডুবে ডুবে অনেক খুঁজল, কিন্তু লোকটির কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবে, রণজয় দেখল, সেখানে সাদা রঙের একটা বল ভাসছে। এই বলটাই লোকটার হাতে ধরা ছিল। লোকটা ডুবে গেলেও বলটা ডোবেনি। রণজয় সেটা ধরে ফেলল।

বলটা খুব বড় নয়, অনেকটা ক্রিকেট বলের মতন। চকচকে কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি, ভেতরটা ফাঁপা। জিনিসটা খুব সুন্দর, তাই রণজয় সেটা নিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল তীরের দিকে। একটা লোক তার চোখের সামনে ডুবে গেল, এজন্য তার মন খারাপ লাগছে। পুলিশকে বোধহয় খবর দেওয়া উচিত— বড় বড় জাল ফেলে যদি দেহটা পাওয়া যায়।

রণজয় আবার আকাশের দিকে তাকাল। সেই কয়েকজন এখনও সেখানে ওড়াউড়ি করছে। মোট পাঁচজন। পিঠে প্যারাসুট বাঁধা নেই, অথচ লোকগুলো আকাশে পাখির মতন ভাসছে কী করে— এই ভেবে রণজয় আশ্চর্য হচ্ছিল, এমন সময় বহুদূর থেকে আর একটা গোল মতন জিনিস বিদ্যুৎবেগে সেখানে উড়ে এল। তার একটা দরজা খুলে যেতেই সেই পাঁচজন লোক ঢুকে গেল তার মধ্যে। সেটা আবার মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে।

রণজয় খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে ভিজে গায়ে বসে রইল নদীর ঘাটে। কী হয়ে গেল ব্যাপারটা? গোল মতন জিনিসগুলো কী? মানুষ আকাশে ভাসে কী করে? ওরা কোথা থেকে এল, কোথায় চলে গেল? ওদের মধ্যে একজন আবার জলে ডুবে গেল কেন? সব ব্যাপারটাই কি স্বপ্ন?

কিন্তু স্বপ্ন হতে পারে না। রণজয়ের হাতে রয়েছে সেই বলটা। এরকম বল সে আগে কখনও দেখেনি। জিনিসটা লোহার নয়, অ্যালুমিনিয়ামেরও নয়। জিনিসটা এমনই চকচকে যে সেটার দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যেতে চায়। এরকম জিনিসের বল রণজয় কখনও দেখেনি। জিনিসটা যে খুব দামি সেটা বুঝতে পেরে রণজয় ঠিক করল, বলটার কথা এখন সে আর কারুর কাছে বলবে না।

রণজয়ের এবার মনে পড়ল তার ছিপটার কথা। সেটা ধরে একটু টান দিতেই বোঝা গেল মাছ আটকেছে। তবে, বেশি বড় মাছ নয়, ছিপটা বেশ হালকা লাগছে। সে এক টান দিতেই মাছটা এসে পাড়ের ওপর পড়ল।

এবার রণজয়ের আরও অবাক হওয়ার পালা। একটা বিরাট বড় কাতলা মাছ। অন্তত চার কেজি হবেই। এত বড় মাছ অথচ এত হালকা লাগল কী করে? ভাগ্যিস সুতো ছিঁড়ে যায়নি। রণজয় দু’হাত দিয়ে মাছটা তুলে ধরল। তবু খুব হালকা লাগছে। এত বড় মাছ এত হালকা হয়! যাই হোক, বলটাকে প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে রেখে রণজয় মাছটা নিয়ে বাড়ি ফিরল।

রণজয়ের বাবা একজন চাষি। রণজয় কিছুটা লেখাপড়া শিখলেও সে কোনও চাকরির চেষ্টা না করে বাবার চাষবাসের কাজেই সাহায্য করে। তা ছাড়া সে গ্রামের ফুটবল টিমে ফুটবল খেলে। সামনের বছর তার বিয়ে হওয়ার কথা।

রণজয়দের বাড়িটা মাটির তৈরি হলেও দোতলা। একে বলে মাটকোঠা। বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢোকান সময় সে মাথায় একটা ধাক্কা খেল। রণজয় বেশ লম্বা হলেও নিজের বাড়ির দরজায় কোনওদিন আগে ধাক্কা খায়নি।

মাছটা উঠোনে ফেলে সে চেষ্টা করে বলল, মা দেখো, আজ কত বড় একটা মাছ পেয়েছি!

রণজয়ের মা কাছেই ছিলেন, মাছটা দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, বাবাঃ, এত বড় মাছ তো অনেকদিন দেখিনি! চার-পাঁচ সের হবে বোধহয়। তোর কাকার বাড়িতে খানিকটা পাঠিয়ে দেব, আর তোর মেসোমশাইয়ের বাড়িতে।

রণজয় বলল, কিন্তু এত বড় দেখতে হলে কী হয়! মাছটা কিন্তু হালকা!

মা মাছটা তোলার চেষ্টা করে বললেন, বলিস কী! হালকা কোথায়! এ তো দারুণ ভারী।

রণজয় অবলীলাক্রমে এক হাতে মাছটা ধরে উঁচু করে বলল, এই যে, দেখছ, কীরকম হালকা?

মা অবাক হয়ে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মাছটা দেখছেন না, রণজয়ের মুখখানা দেখছেন। তারপর বললেন, তোকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে! একটু বেশি লম্বা দেখাচ্ছে কেন রে?

রণজয় হেসে বলল, আমি কি এক সকালের মধ্যেই লম্বা হয়ে গেলাম নাকি?

মা বললেন, কী জানি বাপু। কীরকম যেন লাগছে। তুই কোথাও পড়ে টড়ে গিয়েছিলি নাকি? কপালে নীল রং হয়ে গেল কী করে?

রণজয় একটু আগে ধাক্কা খেয়েছে মাথার মাঝখানে। তার কপালে নীল রং হবে কী করে! সে অবিশ্বাস করে কপালে হাত দিল। না, কপালে কোনও ব্যথাট্যাথা নেই তো!

মা বললেন, যা, আয়নায় দেখে আয়! অনেকখানি নীল রং হয়েছে।

রণজয় উঠে গেল দোতলার ঘরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল সত্যিই তার কপালে একটা হালকা নীল রঙের ছাপ পড়েছে। শুধু কপালে নয়, তার মুখে আর গলাতেও যেন হালকা নীল রঙের ভাব। সহজে বোঝা যাবে না, কিন্তু রণজয় আয়নার কাছে মুখ এনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আর মায়েরা তো ছেলেদের শরীরের যে-কোনও বদল দেখলেই বুঝতে পারেন।

রণজয় হাত দিয়ে ঘষল কপালটা। হাতে কোনও রং লাগল না। তা হলে কপালটা নীল হয়ে গেল কী করে?

আর একটা ব্যাপারেও রণজয় খুব অবাক হয়ে গেল। দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেই সে তার মুখ দেখতে পেয়েছে সব সময়, কিন্তু এখন তাকে ঝুঁকে নিচু হয়ে মুখ দেখতে হচ্ছে। আয়নাটা তো ঠিক এক জায়গাতেই আছে। তা হলে সে কি হঠাৎ খানিকটা লম্বা হয়ে গেল? এ আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার!

রণজয় পকেট থেকে সেই বলটা বার করল। বলটাকে দেখলেই মনে হয় খুব দামি। জিনিসটা এত চকচকে যেন মনে হয়, ওর গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। তা ছাড়া, মনে হচ্ছে যেন ওটার মধ্যে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে। ভালো করে শোনার জন্য রণজয় বলটা কানের কাছে নিয়ে এল। ঘড়ির মতন ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে ঠিকই, তবে খুব আস্তে। তা হলে এটা বল নয়, কিছু একটা যন্ত্র।

সেটা হাতে নিয়ে রণজয় ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে চিন্তা করতে লাগল। ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াল? আকাশ থেকে একটা লোক এই যন্ত্রটা হাতে নিয়ে খসে পড়ল নদীতে। বাকি লোকগুলো হাওয়ায় উড়ছিল, তারপর একটা গোল জিনিস এসে নিয়ে গেল তাদের। এসব কিছুর মানে কী?

সেদিন বিকেলের মধ্যেই রণজয় প্রায় সাত ইঞ্চি বেশি লম্বা হয়ে গেল, আর তার মুখের রং হয়ে গেল রীতিমতো নীল। তার বুক, হাত-পায়েও নীল নীল ছোপ। তার বাড়ির সবাই এই ব্যাপার দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কোনও কঠিন অসুখ হয়েছে রণজয়ের। যদিও অসুখের অন্য কোনও চিহ্ন নেই। তার গায়ের জোর হঠাৎ বেড়ে গেছে অসম্ভব। সে একটা লোহার সিন্দুকও এক হাতে তুলতে পারে। সকালবেলায় অত বড় মাছটা ওই জন্যই তার কাছে অত হালকা লেগেছিল।

নীল রঙের মুখ নিয়ে লজ্জায় সেদিন রণজয় আর বাড়ি থেকে বেরুল না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। সে কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্যিই এসব কিছু হয়েছে? কিন্তু বলের মতন যন্ত্রটা যে হাতে রয়েছে, সেটা তো স্বপ্ন নয়! এই বলটার কথা রণজয় কারুরকে এখনও বলেনি। একবার তার মনে হল, এই বলটা নিশ্চয়ই অপয়া, এটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেই নিশ্চয়ই আবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু জিনিসটা এত সুন্দর যে কিছুতেই ফেলতে ইচ্ছে করে না।

রণজয়ের বাবা ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয়নি। ডাক্তার এসে তাকে দেখে গেলেই সবাই জেনে যাবে তার কথা। তার মুখের রং নীল হয়ে গেছে

শুনেই সবাই দেখতে আসবে তাকে। সবাই তাকে দেখে যদি হাসে! সে পরে কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে রণজয় সেদিন নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে রইল। যতবার সে আয়নায় মুখ দেখেছে, ততবার মনে হয়েছে, তার মুখখানা বেশি রকম নীল হয়ে যাচ্ছে। তবে লম্বায় আর বাড়েনি। সেই সাত ইঞ্চিতেই থেমে আছে।

বলটাকে সে রেখেছে তার টেবিলের ড্রয়ারে। রাত্তিরবেলা চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর রণজয় খাটে শুয়েও শুনতে পাচ্ছে সেটার বিকবিক শব্দ। শব্দটা যেন বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়।

রণজয় আর একবার উঠে ড্রয়ার খুলে বলটাকে দেখল। এবার আবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। বলটা আপনি আপনি ঘুরছে আর সেটা থেকে বলকে বলকে আলো বেরুচ্ছে। ঠিক যেন কীসের সিগন্যাল দিচ্ছে। সেটাতে হাত দিতে রণজয়ের ভয় ভয় করতে লাগল। এটা কোনও সাংঘাতিক যন্ত্র নয় তো? কিংবা বোমাটোমা যদি হয়? আজকাল মানুষ কতরকম যন্ত্র বানাচ্ছে। আমেরিকান আর রাশিয়ানরা মহাশূন্যে কতরকম পরীক্ষা যে চালাচ্ছে, তার ঠিক নেই। সেই রকমই একটা কোনও রকেট ভেঙে পড়েনি তো? কিন্তু এই যন্ত্রটা হাতে নিয়ে যে লোকটা জলে ডুবে যাচ্ছিল, সে তো সাহেব নয়। তার গায়ের রং কালো ছিল।

হঠাৎ রণজয়ের খেয়াল হল, বোধহয় লোকটা কালো ছিল না, ওর গায়ের রং ছিল নীল। ভোরবেলার পাতলা আলোয় রণজয় ঠিক দেখতে পায়নি। অজানা ভয়ে শিউরে উঠল রণজয়। আলো জ্বলে আবার মুখটা দেখল। সে এখন পুরোপুরি নীল রঙের মানুষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ রাগের চোটে রণজয় বলটা নিয়ে এক আছাড় মারল মেঝেতে। কিন্তু সেটা ভাঙল না। একটু তুবড়েও গেল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেটা মাটিতে লাগলেও শব্দ হল না একটুও। রণজয় আরও কয়েকবার বলটা নিয়ে ড্রপ খাওয়াল। না, এটাতে

শব্দ হয় না। এটা সত্যিই একটা অদ্ভুত জিনিস। রণজয় ঠিক করল, এই যন্ত্রটা নিয়ে কোনও বৈজ্ঞানিককে দেখাতে হবে। তাদের গ্রামেরই একটি ছেলের নাম অভিজিৎ কর। সে বিজ্ঞানে খুব ভালো ছাত্র, এখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করে। রণজয় কালই তার কাছে সব কথা খুলে বলবে।

কী মনে হল, রণজয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল বলটা হাতে নিয়ে। নেমে এল নীচে। মাঝরাত, সবাই এখন ঘুমোচ্ছে। উঠোনে একটা শাবল পড়ে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে চলে এল বাড়ির বাইরে। খানিকটা দূর গিয়ে একটা তাল গাছের নীচে বসে পড়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। বেশ বড় একটা গর্ত খোঁড়ার পর বলটাকে তার মধ্যে রেখে মাটি চাপা দিল। গর্তটাকে ভালো করে বুজিয়ে নিশ্চিন্ত হল রণজয়। মাটিতে কান ঠেকিয়ে সে দেখতে চাইল, শব্দটা আর শোনা যায় কিনা! না, আর কোনও শব্দ নেই।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে বাড়ি ফেরার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে অমনি—

রণজয় বেশ সাহসী ছেলে। ভূতের ভয় পায় না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তার দুটো হাত যখন কেউ চেপে ধরল, তখন ভয়ে তাঁর মুখ দিয়ে আঁ আঁ শব্দ বেরিয়ে এল। দু’পাশে তাকিয়ে সে প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না। তারপর দেখল, দু’-তিনজন লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ের রং কুচকুচে কালো কিংবা নীল। তাদের একজন সরু পেনসিলের মতন একটা টর্চ জ্বালাল, তারপর মাটি খুঁড়তে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই সে বার করে ফেলল সেই বলটা। বলটা থেকে তখনও সেইরকম আলোর সিগন্যাল বেরুচ্ছে।

আর দু’জন লোক রণজয়কে এমন চেপে ধরে আছে, যেন সে একটা চোর। কিন্তু রণজয় তো কিছু চুরি করেনি। একবার তার ইচ্ছে হল, চাঁচিয়ে গ্রামের লোকদের ডাকে। তারপর ভাবল, দেখাই যাক না, কী হয়।

লোকগুলো তার হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। রণজয় বুঝতে পারল ওরা যাচ্ছে

নদীর দিকে। নদীর পাশের ফাঁকা মাঠে একটা বিরাট গোল জিনিস রয়েছে। আগের দিন আকাশে রণজয় এইরকমই একটা গোল জিনিস দেখেছিল। সেই জিনিসটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন বেশ লম্বা মতন নীল রঙের মানুষ। তারও হাতে একটা পেনসিলের মতন আলো। রণজয়ের আর কোনও সন্দেহ রইল না যে এরা এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

যে তিনজন লোক রণজয়কে ধরে এনেছিল তারা লম্বা লোকটিকে কিচিরমিচির ভাষায় কী যেন বলল। লম্বা লোকটি বেশ খুশি হয়েছে মনে হল। সে রণজয়ের দিকে ফিরে তার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল। লোকটা কোনও কথা উচ্চারণ করল না। কিন্তু রণজয়ের মনে হচ্ছে, লোকটা ঠিক কথা বলছে তার সঙ্গে। অর্থাৎ লোকটা মনে মনে কথা বলছে, রণজয় ঠিক বুঝতে পাচ্ছে।

লোকটা বলছে, হে পৃথিবীর মানুষ, নমস্কার। আপনি যে আমাদের যন্ত্রটা সাবধানে রেখেছিলেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

রণজয় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে।

লোকটি আবার মনে মনে বলল, হে পৃথিবীর মানুষ, আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।

রণজয় এবার জিজ্ঞেস করল, আপনারা কে?

লোকটি বলল, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনাদের চন্দ্র সূর্য থেকেও অনেক দূরে, সাত নম্বর গ্রহ বলয় থেকে।

লোকটি তারপর সেই গোল জিনিসটার একটা দরজা খুলে বলল, আসুন আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

রণজয় বলল, কেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব কেন? আপনাদের জিনিস তো ফেরত পেয়ে গেছেন।

লোকটি বলল, আপনি আর এখানে থেকে কী করবেন? আপনি তো আর পৃথিবীর

মানুষ নেই। আপনি তো এখন আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন?

রণজয় রেগে গিয়ে বলল, তার মানে?

লোকটি বলল, আপনি রাগ করছেন কেন? আপনি নিজের চেহারা দেখেছেন? আপনার চেহারা বদলে গেছে। আপনি আমাদের যন্ত্রটা ছুঁয়েছিলেন, সেটা থেকে অতি নীল রশ্মি আপনার গায়ে লেগেছে। আপনাকে দেখলে পৃথিবীর মানুষ এখন ভয় পাবে। আপনাকে আর এখানে কেউ আপন করে নেবে না! আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

রণজয় বলল, না, আমি যাব না। আমার বাবা মাকে কিছু না বলে আমি চলে যাব আপনাদের সঙ্গে? তা হয় নাকি?

লোকটি বলল, বাবা মা কী? বাবা মা কাকে বলে?

রণজয় বলল, বাবা মা কাদের বলে আপনি জানেন না? আপনি কীরকম মানুষ?

লোকটি হাসতে হাসতে বলল, আমি তো মানুষ নই। আমাদের ওখানে বাবা-মা বলে কিছু নেই!

রণজয়ের পাশের একজন লোক এই সময় তাকে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। রণজয় এক ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে থাক্কা দিয়ে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, খবরদার! আমার কাছে গায়ের জোর দেখাতে আসবেন না।

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটি কোমর থেকে একটা পিস্তলের মতন অস্ত্র টেনে বার করল। লম্বা লোকটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত তুলে নিষেধ করল তাকে। রণজয়ের চোখে চোখ রেখে বলল, আমাদের সঙ্গে জোর করে লাভ নেই। এই দেখুন।

লোকটি তার হাতের পেনসিলের মতন আলোটা একটা তেঁতুল গাছের দিকে ফিরিয়ে একটা বোতাম টিপল। সেটা থেকে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে চোখের নিমেষে পুড়িয়ে দিল অত বড় গাছটা। অর্থাৎ ওইরকমভাবে ওরা রণজয়কেও পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

লোকটি আবার বলল, আপনাকে আমরা মারতে চাই না। আমাদের একজন এই

পৃথিবীর জলে ডুবে মারা গেছে, তাই এখান থেকে আমরা একজনকে নিয়ে যাব, তাতে দোষের তো কিছু নেই। আপনি আপত্তি করছেন কেন? আপনাকে আমরা যত্ন করেই রাখব।

রণজয় তবু জোর দিয়ে বলল, আমি যাব না। আমি কিছুতেই যাব না। যেখানকার লোকরা বাবা মা কাকে বলে তাই জানে না, সেরকম অদ্ভুত বিচ্ছিরি জায়গায় আমি কিছুতেই যাব না।

লোকটি বলল, ঠিক আছে, আপনার জন্য আমরা না হয় বাবা মা তৈরি করে দেব। এমন কিছু শক্ত নয়।

রণজয় বলল, বাবা মা আবার তৈরি করা যায় নাকি? কী বুদ্ধি আপনার!

এবার দু'জন লোক একসঙ্গে চেপে ধরল রণজয়কে। রণজয় একটা ঘুষি মারল একজনের মুখে। সে ছিটকে যেতেই সে অন্যজনের পেটে টুঁ মারল মাথা দিয়ে। এখন যেন তার গায়ে অসুরের মতন শক্তি।

কিন্তু যতই জোর থাক, চারজন একসঙ্গে আক্রমণ করায় সে আর পারল না। পড়ে গেল মাটিতে। একজন তার বুকে চেপে বসে নাকের ওপর ঘুষি মারতেই সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল তার চোখে।

রণজয় কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। আবার চোখ মেলে দেখল, লোকগুলো তাকে ছাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে সেই গোল জিনিসটার দিকে। তারপর ধরাধরি করে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। রণজয়ের আর নিস্তার নেই। তাকে চলে যেতে হবে কোন অচেনা অদ্ভুত জায়গায়। এই পৃথিবীকে আর দেখতে পাবে না।

লম্বা লোকটি তখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, রণজয় শেষ শক্তিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। লম্বা লোকটিকে এক ধাক্কা দিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। লম্বা লোকটিও নীচে পড়ে গেছে। কিন্তু সে ওঠবার আগেই রণজয় দৌড়োতে শুরু করল নদীর দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়েছে, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেই সে একমাত্র বেঁচে যেতে পারে।

জলের মধ্যে এদের আগুন-অস্ত্র কোনও কাজে লাগবে না। তা ছাড়া এরা বোধহয় সাঁতার জানে না। এদের একজন জলে ডুবে মরেছে।

লম্বা লোকটি রণজয়কে প্রায় ধরে ফেলেছিল, তার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সে এত ভালো সাঁতার জানে যে এরা জলে নামলেও তাকে ধরতে পারবে না। রণজয় এক ডুব দিয়ে চলে গেল জলের গভীরে। অনেকখানি দূরে গিয়ে সে যখন দম নেবার জন্য আবার মাথা তুলল, দেখতে পেল যে লম্বা লোকটির পাশে অন্য লোকগুলোও এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তারা জলে নামেনি। ওরা বিজ্ঞানের এত বেশি উন্নতি করেছে বটে, তবু জলকে ভয় পায়। হয়তো ওদের গ্রহে এরকম নদীই নেই।

লোকগুলো কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করে তারপর আবার ফিরে গেল গোল জিনিসটার কাছে। একটু বাদেই সেটা উড়তে উড়তে চলে এল নদীর ওপরে। রণজয়ের ঠিক মাথার কাছে। রণজয় আবার ডুব দিল। শৌঁ শৌঁ করে ডুব সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে লাগল স্রোতের সঙ্গে। আবার মাথা তুলতেই গোল জিনিসটা তেড়ে এল তার দিকে। সেটা থেকে একটা দড়ির ফাঁস ঝুলছে। যেন মাছের মতন রণজয়কে গোঁথে জল থেকে তুলে নেবে। বুক ভরতি নিশ্বাস নিয়ে রণজয় ডুবে গেল অনেক নীচে।

বহুক্ষণ পর্যন্ত চলল এইরকম। রণজয় হাঁপিয়ে গেছে, দম ফুরিয়ে যাচ্ছে, তবু সে হার মানবে না।

ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এ লড়াই শেষ হল। গোল জিনিসটা আর অপেক্ষা করল না, সোজা উঠে গেল ওপরের দিকে। কী অসম্ভব তীব্র গতি। প্রায় চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিশ্চিত হয়ে রণজয় আস্তে আস্তে চলে এল তীরের দিকে। ওপরে উঠে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এত ক্লান্ত যে ধপ করে মাটিতে পড়ে গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রইল।

আকাশ এখন পরিষ্কার। অল্প অল্প আলো ফুটছে, তারারা সব বিদায় নিচ্ছে। ভোরের

আকাশ কী সুন্দর দেখায়! অথচ ওই আকাশে কতরকম রহস্য আছে কে জানে! ওই আকাশে বেড়াতে যেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওই লোকগুলো তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল এমন একটা জায়গায়, যেখানে নদী নেই। যেখানকার লোক মা বাবা কাকে বলে জানে না। সেখানকার চেয়ে এই পৃথিবী অনেক ভালো।

তারপর রণজয় তাকাল নিজের হাত পায়ের দিকে। তার সারা শরীর এখন নীল। সে এখন আর মানুষের মতন নয়! কেউ আর তাকে আপন করে নেবে না। হয়তো ছেলেরা তাকে দেখে ঢিল ছুড়বে। বাচ্চারা তাকে দেখে ভয় পাবে। রণজয়ের কান্না পেয়ে গেল। একা একা খানিকক্ষণ কাঁদল সে। তারপর চোখ মুছে ভাবল, আর যে যাই ভাবুক, আমার মা-বাবাও কি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে? না, তা হতেই পারে না!

নীল মানুষের কাহিনি

দোতলার বারান্দায় পাপু একা একাই একটা বল নিয়ে খেলছিল। একবার বলটা রেলিং টপকে পড়ে গেল পেছনের মাঠে।

পেছন দিককার মাঠটায় বড় বড় ঘাস জন্মে গেছে। মাঠের ওপাশে বড় বড় গাছের একটা বাগান। সেখানে আম, জাম, লিচু গাছ ছাড়াও অনেকগুলো বাঁশ গাছ আছে। সেই বাঁশবনে নাকি রাত্তিরবেলা শাঁকচুম্মিরা আসে। তারা মাঝরাত্তিরে নাকিসুরে শিয়ালের মতন গান গায়। এদিকে পাপুর একা একা যাওয়া নিষেধ।

এখন কেউ দেখছে না বলে পাপু মাঠে নেমে এল বলটা খুঁজতে। কিন্তু বলটাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই ঘাসের মধ্যে লুকিয়েছে। বলগুলো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে লুকিয়ে পড়ে।

বলটা খুঁজতে খুঁজতে পাপু চলে এল বাগানের কাছে। তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বড় জামরুল গাছের পাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের বাড়ির দিকে।

পাপু প্রথমে ভেবেছিল নিশ্চয়ই লোকটা চোর। তারপরই মনে হল, চোর নয়, একটা দৈত্য। কিংবা বকরাক্ষস।

লোকটা দৈত্যের মতনই লম্বা, মাথায় বড় বড় চুল, গায়ের রং একদম নীল। কোনও মানুষের রং ওরকম হয় না। জানলা দরজা রং করার মতন কেউ যেন ওকে নীল রং মাখিয়ে দিয়েছে সারা গায়ে।

পাপু পেছন ফিরে দৌড়ে পালাতে যেতেই লোকটা তার নাম ধরে ডাকল, পাপু, শোনো—

তাতে পাপু আরও ভয় পেয়ে গেল। দৈত্যটা তার নাম জানল কী করে? নিশ্চয়ই এবার কপাৎ করে খেয়ে ফেলবে!

পাপু কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, আমি আর করব না! আমি আর কোনওদিন দুষ্টমি করব না! আমাকে মেরো না!

লোকটা বলল, না, তোমাকে মারব না। তোমার দিদিকে একবার ডেকে দিতে পারো?

পাপু বলল, এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি! আমাকে ছেড়ে দাও?

লোকটা বলল, আমি তো তোমাকে ধরে রাখিনি। তুমি ভয় পেয়ো না!

পাপু তক্ষুনি বাড়ির দিকে দৌড়োল। ঘাসে পা জড়িয়ে পড়ে গেল একবার। উঠে আবার ছুটল।

বারান্দায় উঠেই পাপুর সাহস ফিরে এল। সে তখন বাগানের দিকে তাকিয়ে দৈত্যটার উদ্দেশ্যে বলল, এক লাথি! দিদিকে ডেকে দেব না, ছাই দেব! ভূত আমার পুত, পেতনি আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবি আমার কী?

পাপুর দিদি চিত্রা একতলাতেই ছিল! সে বলল, এই পাপু, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?

বাবু বলল, দেখো না দিদি, ওইখানে একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে!

চিত্রা হেসে ফেলল। পাপুটা দারুণ গুলবাজ! কত জিনিস যে বানিয়ে বানিয়ে বলে।

চিত্রা বলল, তুই বুঝি দৈত্যকে লাথি মারছিস?

দিদি, দৈত্যটা তোমাকে ডাকছে!

কেন, আমাকে আবার দৈত্যর কী দরকার পড়ল?

ওই দেখো না, দৈত্য হাতছানি দিচ্ছে! ই-ল-ল!

পাপু জিভ ভেঙিয়ে দিল। চিত্রা তখন বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই পাপু আবার দারুণ উৎসাহে বলল, ওই দেখো, দেখতে পাচ্ছ, বড় জামরুল গাছটার পাশে—

চিত্রার মনে হল, কে যেন গাছের পাশ থেকে সরে গেল। সে তখন চোঁচিয়ে বলল, কে? কে ওখানে?

সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে একটু একটু। এখনও আকাশের আলো যায়নি। এক্ষুনি কি আর চোর আসতে পারে? চিত্রা সাহস করে নেমে এল মাঠে। আবার জিঞ্জেস করল, কে?

পাপু বলল, দিদি, যেয়ো না, সত্যি সত্যি দৈত্য।

তখন বাগানের মধ্য থেকে কেউ একজন ডাকল, চিত্রা শোনো—

চিত্রা একেবারে কেঁপে উঠল। কী গম্ভীর গলার আওয়াজ। যেন হাঁড়ির মধ্য থেকে কথা বলছে। কিন্তু কে তার নাম ধরে ডাকছে?

সে আবার বলল, কে ওখানে?

এবার জামরুল গাছের আড়াল থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। সেই বিশাল চেহারা আর অদ্ভুত নীল রং দেখে চিত্রা পাপুর থেকেও বেশি ভয় পেয়ে গেল। গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। কোনওক্রমে বলল, ওমা... ওমা... ও... মা... গো!

পেছন ফিরে দৌড়োতে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল চিত্রা। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা বলল, চিত্রা, ভয় পেয়ো না, আমি রণজয়—

দূর থেকে পাপু তখন চ্যাঁচাচ্ছে, ও মা, এসো, বাবা, এসো, ছোটকাকা এসো, দিদিকে দৈত্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে— বিরাট দৈত্য!

লোকটা নিচু হয়ে কয়েকবার ডাকল, চিত্রা, চিত্রা—। চিত্রা সত্যিই অজ্ঞান। সে তখন চিত্রাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল বাগানের মধ্যে।

পাপুর চিৎকারে ছুটে এল চিত্রার মা আর ছোটকাকা। ছোটকাকা এক ধমক দিয়ে বলল, কী পাগলের মতন চ্যাঁচাচ্ছিস?



পাপু লাফাতে লাফাতে বলল, দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে, ওই বাগানের মধ্যে—
শিগগির...

মা আর ছোটকাকা দু'জনেই ছুটে গেলেন বাগানের দিকে, ছোটকাকাই আগে আগে।
বাগানের মধ্যে ঢুকেই তিনি দেখলেন, চিত্রা মাটিতে পড়ে আছে, আর কী একটা বিশাল
জন্তুর মতন ঝুঁকে আছে তার মুখের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটকাকা উলটো দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল, ওরে বাবা রে, গোরিলা,
কিং কং— বন্দুক, বন্দুক আনতে হবে!

মা তবু এগিয়ে গেলেন। তিনিও দেখলেন, সত্যিই একটা দৈত্যের মতন মানুষ তাঁর
মেয়েকে আবার মাটি থেকে তুলে নিচ্ছে।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ছেড়ে দাও, আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও!

লোকটা মাকে দেখে বলল, ভয় পাবেন না। আমি রণজয়!

মা তাতেই ভয় পেয়ে গেলেন। হাত জোড় করে বললেন, তুমি যেই হও, আমার
মেয়েকে ছেড়ে দাও! তুমি যা চাও, তাই দেব!

চিত্রার জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে মা মা করে ডেকে উঠল। তারপর লোকটার হাতে
কামড়ে দিতেই লোকটা ছেড়ে দিল তাকে।

এরমধ্যে ছোটকাকা চ্যাচামেচি করে আরও অনেক লোক জুটিয়েছে। লাঠি, দা, শাবল
নিয়ে দশ-বারোজন লোক তেড়ে এল বাগানের মধ্যে। দৈত্যের মতন লোকটা দাঁড়িয়েই
ছিল। প্রথম একজন তার গায়ে লাঠির বাড়ি মারতেই সে লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে দেশলাই
কাঠির মতন পট করে ভেঙে ফেলল। তারপর দৌড়োতে লাগল পেছন ফিরে। অন্যেরা
তাড়া করে গেল— কিন্তু অত বড় লোকটার সঙ্গে দৌড়ে কেউ পারে না! বাগানের পর
অনেকটা জলা জায়গা, তারপর জঙ্গল। লোকটা হুপহুপ করে জলাভূমির মধ্যে দিয়ে
দৌড়ে প্রায় চোখের নিমেষে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। সে পর্যন্ত আর যাবার সাহস
হল না কারুর!

নিশানপুর গ্রামে দারুণ একটা উত্তেজনা পড়ে গেল। তারা স্বচক্ষে একটা দৈত্য দেখেছে। কতরকম গল্প তৈরি হতে লাগল তাকে নিয়ে। কেউ বলল, তার মূলোর মতন দাঁত। কেউ বলল, তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। কেউ বলল, ওটা দৈত্য না, আসলে একটা গোরিলা। কেউ বলল, যাঃ, ভারতবর্ষে গোরিলা থাকে না, ওটা নিশ্চয়ই শিম্পাঞ্জি কিংবা ওরাং ওটাং! কেউ বলল, তা কী করে হবে? ও যে কথা বলতে পারে, বাংলায় কথা বলে! কেউ বলল, তা হলে নিশ্চয়ই কোনও তান্ত্রিক সাধক মড়াকে জাগিয়েছে।

চিত্রার মা শুধু বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ও বলেছিল, ওর নাম রণজয়! কেন বলল, ও কথা? রণজয় নামে পাশের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলেটা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেউ তার খবর জানে না!

ছোটকাকা বললেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওটা মানুষ নয়। তেলতেলে নীল রঙের গা। মুখটা সিংহের মতন। অদ্ভুত কোনও জন্তুই হবে। চিত্রা কোনও কথা বলে না, শুধু হেঁচকি তুলে কাঁদে। সে এমন ভয় পেয়েছে যে কিছুতেই সুস্থ হতে পারছে না। পাপু লাফালাফি করে বলে, আমি কিন্তু আগে দেখেছি, আমি সবচেয়ে আগে দেখেছি।

সত্যি, পাপু ঠিক সময় চ্যাচামেচি না করলে দৈত্যটা চিত্রাকে ধরেই নিয়ে যেত। খবরের কাগজেও ছাপা হয়ে গেল, ‘নিশানপুর গ্রামে দৈত্যের আবির্ভাব!’

দৈত্যটির নাম কিন্তু সত্যিই রণজয়। কিছুদিন আগেও সে মানুষ ছিল।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে রণজয় একটা গাছের নীচে বসে হাঁপাতে লাগল। খিদেতে তার পেটের মধ্যে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। গত চার-পাঁচদিন সে কিছুই প্রায় খায়নি। এই জঙ্গলে ফলমূল প্রায় কিছুই নেই। জন্তু জানোয়ারও কিছু নেই যে তাদের মেরে মাংস খাওয়া যাবে। শুধু আছে কিছু ইঁদুর আর শেয়াল, তাদের মাংস তো খাওয়া যায় না। গ্রামের কোনও মানুষ তাকে খাবার দেবে না। লোকেরা তাকে দেখলেই ভয় পায়!

একটুক্ষণ বসার পরই রণজয় ভাবল, এখানে থাকা ঠিক নয়। তাকে জলের কাছে যেতে হবে। তার এখন গায়ে এত জোর যে পৃথিবীর কোনও মানুষ তাকে আর ধরে

রাখতে পারবে না। কিন্তু আকাশ থেকে মাঝে মাঝে মানুষের মতন একরকম প্রাণী আসে তাকে বন্দি করার জন্য। ওই প্রাণীরাই আজ রণজয়ের এই অবস্থা করেছে। ওদের ছোঁয়াতেই রণজয়ের চেহারা বদলে গেছে এরকম। ওরা চায় রণজয়কে তাদের গ্রহে নিয়ে যেতে। ওরা বড় বড় জাল ফেলে রণজয়কে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। ওদের হাতে থাকে আগুনের টর্চ লাইট। কিন্তু রণজয় কিছুতেই ধরা দেবে না। সে এই পৃথিবী ছেড়ে যাবে না। ওদের জব্দ করার একমাত্র উপায় জলের মধ্যে নেমে পড়া। ওরা জলকে ভয় পায়।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা খাল আছে। কচুরিপানায় ভরা। রণজয় এসে তার ধারে বসে হাত দিয়ে কচুরিপানা সরাতে লাগল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করার পর সে জল তুলে মুখটা ধুল। চামড়ার ওপর জোর দিয়ে হাত ঘষতে লাগল, যদি নীল রং ওঠে। না, কিছুতেই ওঠে না! আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে। আয়নার মতন জলে রণজয় নিজের মুখের ছায়া দেখল। সত্যিই, কেন লোকেরা তাকে দেখে ভয় পাবে না? এমনকী চিত্রার সঙ্গে এত ভাব ছিল, সেও চিনতে পারল না। সেও ভয় পেয়ে তার হাতে কামড়ে দিয়েছে। রণজয় এখন প্রায় সাড়ে সাত ফিট লম্বা, মুখখানাও সেইরকম প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রংও নাকি নীল ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে তো কেউ ভয় পেত না।

মাথার ওপরে একটা ঘর্ঘর শব্দ হল। একটা গোল মতন জিনিস ওপর থেকে নেমে আসছে। তার থেকে টর্চলাইটের মতন একটা সরু আগুনের রেখা এক একটা গাছের ওপর পড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে দিচ্ছে গাছটাকে। ওরা আবার খুঁজতে এসেছে রণজয়কে। রণজয় টুপ করে নেমে গেল জলের মধ্যে। কোনও শব্দ না করে নাক পর্যন্ত ডুবে রইল।

গোল জিনিসটা থেকে একটা দরজার মতন খুলে গেল, সেখান থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। তারপর হাওয়ায় ঠিক পাখির মতন উড়তে উড়তে নেমে এল নীচে।

এখন ওদের দেখলেই রণজয়ের রাগে গা জ্বলে যায়। দাঁত কিড়মিড় করে। হাতের

কাছে ওদের একটাকে পেলে সে খুনই করে ফেলত। সে তো কোনও দোষ করেনি, তবু ওদের জন্য কেন তার এত কষ্ট! কিন্তু রণজয় ওদের কাছাকাছি যেতে সাহস পায় না। ওদের কাছে নানারকম অদ্ভুত যন্ত্রপাতি আছে।

ওরা যেন কুকুরের মতন গন্ধ শুনতে পারে। ঠিক যে রাস্তা দিয়ে রণজয় এসেছিল, সেই রাস্তা ধরে লোকটা হেঁটে এসে খালের ধারে দাঁড়াল। যদিও সে কোনও শব্দ উচ্চারণ করলে না, তবু রণজয় স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে যে সে বলছে, নীলমানুষ লুকিয়ে থেকো না, আমাদের সঙ্গে চলে এসো। এখানে তুমি বাঁচতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে এসো!

রণজয় কোনও উত্তর দিল না। সে যে এখানে আছে সেটা বুঝতে না দিয়ে ডুবে গেল জলের মধ্যে। ডুব সাঁতার কেটে চলে গেল অনেকখানি।

একটু বাদে লোকটা আবার উড়তে উড়তে উঠে গেল ওপরে। রণজয়ের খুব ইচ্ছে করেছিল লোকটার গায়ে জলের ছিটে দেয়। ওরা যখন জলকে এত ভয় পায়, তখন নিশ্চয়ই জলের ছোঁয়া লাগলে কুঁকড়ে যাবে। কিন্তু এবার আর তা করা গেল না।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে রণজয় আবার ওপরে উঠে এল। কিছু খাবার জোগাড় করতেই হবে। কোনওদিন সে চুরি ডাকাতি করেনি, এবার বাধ্য হয়েই তা করতে হবে, উপায় কী!

আবার হাঁটতে শুরু করল সে। জঙ্গলের অন্য পাশ দিয়ে একটা বড় রাস্তা গেছে। সেখানে রাত্তিরবেলা অনেক লরি যায়। ইচ্ছে করলেই সে জোর করে একটা লরি থামাতে পারে। কিন্তু লরিতে তো আর খাবার পাওয়া যাবে না।

অন্ধকার গাঢ় হওয়ার পর সে আবার একটা গ্রামে ঢুকে পড়ল। চুপিচুপি এক একটা বাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি দেয়। কোনও কোনও বাড়িতে সে দেখতে পায়, লোকেরা খেতে বসছে। তার জিভে জল আসে। ভিখিরিরাও এই সময় চাইলে কিছু খাবার পেত। কিন্তু তাকে তো কেউ ভিক্ষে দেবে না।

একটা বাড়ির উঠানে একটা গাছে হলদে হলদে কী যেন ফল ফলে আছে। সে ভাবল পেয়ারা। পট পট করে কয়েকটা ছিঁড়ে নিয়ে দেখল, পেয়ারা তো নয়, পাতি লেবু। খালিপেটে কেউ লেবু খায় নাকি! তবু খিদের চোটে সেই লেবুগুলোই নখ দিয়ে চিরে রস চুষে চুষে খেতে লাগল। একটু নুন থাকলে তবু ভালো হত। দাঁত টকে গেল একেবারে।

আর একটা বাড়ির পেছনে মস্ত বড় খাঁচায় অনেকগুলো মুরগি রয়েছে। একটা মুরগি চুরি করে নিলে বেশ হয়, কোনওরকমে আগুন জ্বেলে ঝলসে খাওয়া যায়।

এরকম চিন্তায় রণজয় নিজেই অবাক হয়ে গেল। সে কলেজে পড়াশুনো করেছে। এখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। ক’দিন আগেও সে ছিল অন্য যে-কোনও ছেলের মতন। এখন চেহারাটা বড় হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কি সত্যি সত্যি দৈত্য হয়ে যাচ্ছে নাকি? কোনদিন মানুষ ধরে ধরে খাবে? না, না, এরকম করলে চলবে না। তাকে মানুষই থাকতে হবে।

কিন্তু খাবার তো জুটছে না। রণজয় নিজের বাড়িতেও আর ফিরে যাবে না, তার বাবাই তাকে দেখে ভয়ের চোটে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই বলেছিলেন, দূর হ, দূর হয়ে যা! ভূত হয়ে কেন জ্বালাতে এসেছিস আমাদের! সে যতই বলেছিল, আমি ভূত নয়, কেউ বিশ্বাস করে না। তার গলার আওয়াজও বদলে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে রণজয় দেখল, একটা বাড়ির দরজায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ভেতরটা অন্ধকার। রণজয় তালাটা ধরে একটু চাপ দিতেই মট করে তালাটা ভেঙে গেল। দরজা ঠেলে সে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল। বাড়ির সামনে একটা বড় উঠোন, চারদিকে দেয়াল-ঘেরা। রণজয় সেটার ভেতরে ঢুকতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে এল। কুকুরটা কাছে আসতেই রণজয় সেটার চার পা ধরে ছুড়ে দিল পাঁচিলের বাইরে। বাইরে পড়েই কুকুরটা কেঁই কেঁই করতে করতে দূরে পালিয়ে গেল খুব ভয় পেয়ে।

বাড়িতে আর কোনও মানুষজন নেই। রণজয় খুঁজতে লাগল রান্নাঘর। রান্নাঘরে খাবার দাবার কিছু নেই। কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ রয়েছে একটা ঝুড়িতে। আর কয়েকটা

হাঁড়িকুড়ি ঘেঁটে চাল আর ডালও পাওয়া গেল। রণজয় ঠিক করল সে রান্না করেই খাবে।
উনুনের পাশে দেশলাই রয়েছে। রণজয় উনুন ধরিয়ে ফেলল খানিকটা চেষ্টা করে।

রান্নাটান্না সে কখনও করেনি। কিন্তু খিচুড়ি তো সবাই রাঁধতে পারে। একটা হাঁড়িতে
অনেকখানি জল নিয়ে তার মধ্যে বেশ খানিকটা করে চাল আর ডাল ঢেলে দিল। এবার
তো আপনা-আপনি খিচুড়ি হয়ে যাবে। কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজও ছেড়ে দিল তার
মধ্যে। নুনও আছে, দিবি খাওয়া জমবে।

সবসুদ্ধ উনুনে চাপিয়ে দিয়ে রণজয় ব্যগ্র হয়ে বসে রইল। কতক্ষণে রান্না হবে? সে
আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। প্রতিটি মিনিট মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা। সামনে বসে
থাকলে আরও বেশি খিদে পায়। সে রান্নাঘর ছেড়ে উঠে এল। অন্য একটা ঘরে এসে
শুয়ে পড়ল খাটের ওপর। উঃ কতদিন পর সে খাট বিছানায় শুচ্ছে! ঘুমিয়ে পড়লে চলবে
না। খিচুড়ি যদি পুড়ে যায়! তা ছাড়া খিচুড়ি খেয়েই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাড়ির
লোকেরা যে-কোনও সময় ফিরে আসতে পারে। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তাকে
পালাতে হবে জঙ্গলে।

রণজয় একটুক্ষণ মাত্র শুয়েছিল, তারপরেই খুটখাট শব্দ হল বাইরে। এই রে, বাড়ির
লোকেরা ফিরে এসেছে! রণজয় বাইরে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যেতে পারে।
কিন্তু খিচুড়ি খাওয়া হবে না। বাড়ির লোকেরা রান্নাঘরে আপনা আপনি খিচুড়ি রান্না হতে
দেখে কি অবাক হবে!

ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলছে। রণজয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সরু একটা টর্চের
আলো পড়ল ঘরের মধ্যে। এই রে, অন্য গ্রহের অধিবাসীরা কি এখানেও রণজয়কে
খুঁজতে এসেছে নাকি? রণজয় ঠিক করল, তা হলে দরজার খিলটা খুলে নিয়ে ওদের
মাথা ফাটিয়ে দেবে। কিছুতেই ধরা দেবে না সে।

দুটো লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। অন্য গ্রহের লোক নয়, তারা মানুষ। দেখলেই বোঝা
যায়, এ বাড়ির লোক নয়, চুরি করতে এসেছে।

মাঝখানে আর একটা দরজা খোলা ছিল, রণজয় সেটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। লোক দুটো সারা ঘরে আলো ফেলে দেখে নিল আগে। তারপর দেয়াল আলমারির তালা ভাঙতে লাগল।

বাড়িটা খুব একটা বড়লোক কারু নয়। সাধারণ বাড়ি। চোর দুটো তাদেরই সর্বনাশ করতে এসেছে। আগে চোরের কথা শুনলে রণজয়ের ভয় করত, এখন মজা লাগছে খুব।

আলমারি থেকে কী যেন বনবান করে নীচে পড়ল। চোর দুটো ফিসফাস করে যাচ্ছে।

খানিকটা বাদে একটা চোর এদিকে উঠে এল। মাঝখানের দরজাটার পাশ দিয়ে যেতেই রণজয় লম্বা হাত বাড়িয়ে চোরটার ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে এল। সে কোনওরকম শব্দ করার আগেই রণজয় চেপে ধরল তার মুখ। এ ঘরেও বিছানা পাতা ছিল, একটা বালিশের তোয়ালে দিয়ে ওর মুখটা বেঁধে ফেলল। তারপর চাদর দিয়ে হাত পা বাঁধল ভালো করে। এবার সে লোকটাকে কাঁধে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল উঠোনে। বাইরে চাঁদের আলোয় রণজয়ের চেহারা দেখে চোরটার যেন চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু কোনও শব্দ করতে পারছে না। তাকে মাটিতে শুইয়ে রেখে রণজয় আবার ফিরে এল ভেতরে।

বাকি চোরটা মন দিয়ে চুরি করে যাচ্ছে। আলমারি থেকে অনেকগুলো স্টিলের থালাবাসন থলিতে ভরেছে। একটা ছোট লোহার বাস্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এখন। সেটা কিছুতেই খুলতে পারছে না।

রণজয় ঠিক চোরটার পেছনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চোরটা তার বাটালি, ছোট হাতুড়ি, একটা করাত রেখেছিল পাশে। রণজয় টুকটাক করে এক একটা সরিয়ে নিচ্ছে। লোকটা করাতটা খোঁজার জন্য পাশে হাত দিয়ে পেল না। খুব অবাক হয়ে বলল, আরেঃ! তারপর হাতুড়িটাও পেল না। তখন ফিসফিস করে ডাকল, এই হেবো, হেবো, তুই হাতুড়ি আর করাত নিয়েছিস?

কোনও সাড়া নেই।

চোরটা আবার ডাকল, এই হেবো, হেবো! কোথায় গেলি!

রণজয় চোরটার মাথার চুল ধরে পেছন থেকে একটু টান দিল। লোকটা উঃ বলে পেছন ফিরে তাকাল।

এই চোরটা কিন্তু আগের চোরটার থেকে অনেক বেশি সাহসী। গায়ের জোরও বেশি। রণজয়কে দেখেই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। রণজয় তার ঘাড়টা চেপে ধরে বলল, কোথায় যাচ্ছ চাঁদু?

চোরটা সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে একটা ছুরি বার করে বসিয়ে দিল রণজয়ের বুকে। রণজয় পেছন দিকে উলটে পড়ে গেল। বুক থেকে রক্ত বেরুচ্ছে ফোয়ারার মতন।

রণজয়ের মনে হল, এবার সে মরে যাচ্ছে। ভাবল, যাক ভালোই হল। এরকম ভাবে দৈত্য হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? কিন্তু মরার আগে খিচুড়িটা খাওয়া হল না?

একটু বাদে সে আবার ভাবল, কই, মরলাম না তো এখনও! ব্যথাও করছে না। চোরটা উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে আছে তার দিকে। রণজয় একটানে ছুরিটা তুলে ফেলল। তারপর সে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখল। তার বুক থেকে যে রক্ত বেরিয়ে ছিল, সেটা জমে গেছে এরই মধ্যে। রবারের মতন শক্ত। রক্তের ফোয়ারাগুলো কতকগুলো নীল রবারের সুতোর মতন ঝুলছে তার বুক থেকে। রণজয় পটপট করে টেনে টেনে সেগুলো ছিঁড়তে লাগল।

লোকটা এবার ভয় পেয়েছে। টর্চ খসে পড়ল হাত থেকে। আঁ আঁ করে চৌচিয়ে উঠল। পালাবারও শক্তি নেই।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দু' হাতে তুলে ছুড়ে ফেলল ঘরের মেঝেতে। আবার সেইভাবে তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একবার ওইরকম ছুড়লে লোকটার একটাও হাড় আঁস্ট থাকবে না। রণজয় এই চোরটারও মুখ, হাত-পা বাঁধল। বাইরে উঠোনে এনে রাখল অন্য চোরটার পাশে।

তারপরেই রণজয় ছুটে গেল রান্নাঘরে। খিচুড়ি পুড়ে গেছে নাকি? না, পোড়েনি, সবেমাত্র ফুটে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে ফেলল। আর থালাটালয় ঢালা হল না, হাঁড়ি থেকেই সেই গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে ফেলল সবটা। নিজের হাতের রান্না তো, অপূর্ব স্বাদ লাগল। পেট ভরতি হওয়ায় বেশ তৃপ্তি করে ঢেঁকুর তুলল একবার।

বাইরে বেরিয়ে এসে চোর দুটোকে একটা সরল রেখার মতন লম্বা করে সাজিয়ে দিল উঠোনে। বাড়ির লোকজন ফিরে এলেই যাতে দেখতে পায়। চোর দুটো এক একবার রণজয়ের দিকে তাকাচ্ছে আর ভয়ে চোখ বুজছে।

এবার রণজয়কে যেতে হবে। বাড়ির লোকেরা ফিরে এসে চোর দুটোর কাছে নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক গল্প শুনবে। সবাই ভাববে, এক দৈত্য এসে ওদের বন্দি করে গেছে। নিজেকে দৈত্য ভাবতে খুব খারাপ লাগে রণজয়ের। সে যদি মানুষের উপকার করে এখন থেকে, তা হলেও কি তাকে দৈত্য ভাববে মানুষ?

আবার বাড়ির মধ্যে ফিরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে রণজয় কাগজ আর পেনসিল জোগাড় করল। তারপর একটা চিঠি লিখল—

মহাশয়, আমি আপনার বাড়িতে খিচুড়ি খেয়েছি বটে, কিন্তু তার বদলে এই চোর দুটোকে ধরে দিয়েছি। আমি হঠাৎ এই সময় না এলে, এরা আপনার সবকিছু নিয়ে পালাত। সুতরাং, আশা করি, আপনার খানিকটা চাল আর ডাল খরচ হওয়ার জন্য দুঃখিত হবেন না। ইতি নীল মানুষ।

চিঠিটা চোর দুটোর পাশেই একটা ইট চাপা দিয়ে রাখল রণজয়। আপনমনেই বলল, দেখা যাক, এর পরেও ওরা আমাকে দৈত্য ভাবে কিনা।

তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। যদিও সে জন্তু নয়, তবু এখন তাকে আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে হবে।

নীল মানুষের দুঃখ

রণজয় একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে ছিল, একটা গাড়ির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে বসে অবাক হয়ে তাকাল। এই জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি আসবে কী করে?

সে দেখল, জঙ্গলের মধ্যে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে একটা জিপগাড়ি খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় পুলিশের জিপ। রণজয় একটা মোটা বটগাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পুলিশরা কি তাকেই খুঁজতে আসছে? রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এইরকমভাবে আর কতদিন কাটানো যায়? কতদিন সে কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলেনি! তাকে দেখলে সবাই ভয় পায়। তার মা-বাবা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারে না। সে এখন সাধারণ মানুষের প্রায় দ্বিগুণ লম্বা, তার গায়ের রং গাঢ় নীল। তার মাথার চুল নীল। হাত পায়ের নখগুলোও নীল। কেন যে সে নদীর ধারে সেই অদ্ভুত ধাতুর বলটা ছুঁতে গিয়েছিল। তারপর থেকেই তো তার এই অবস্থা! এবার তাকে যে দেখে সেই ভাবে যে সে বুঝি একটা দৈত্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে সেই আগেকার রণজয়ই আছে, তা কেউ জানে না।

পুলিশের জিপটা একটু দূরে থামল। তার থেকে নামল পাঁচজন লোক। এদের মধ্যে দু'জনের কোমরে রিভলবার গোঁজা, আর তিনজনের হাতে লাঠি। নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলে তারা পাঁচজন পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

রণজয় নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না। সে যদি পালাবার ইচ্ছে করে, তা হলে সে এত জোর দৌড়োতে পারে যে জিপগাড়িটাও তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু তার তখন দৌড়োতে ভালো লাগছিল না। দেখাই যাক না কী হয়।

একজন পুলিশের লোক খুঁজতে খুঁজতে এদিকেই আসছে। একটু বাদেই রণজয়কে দেখতে পাবে। লোকটা একটা চিউয়িংগাম চিবুচ্ছে।

লোকটা এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে হাঁটছে আর আশ্তে আশ্তে শিস দিচ্ছে। ভালো শিস দিতে পারে না। রণজয় খুব জোরে একবার শিস দিল। লোকটা চমকে উঠল একেবারে। পাখি মনে করে ওপরের দিকে তাকাল।

সেইরকম ওপরের দিকে তাকাতে তাকাতে গাছের এদিকটায় এল বলেই সে রণজয়কে প্রথমে দেখতে পায়নি। রণজয় নিজেই লোকটির কাঁধে হাত রাখল।

লোকটি আঁ আঁ করে চৈঁচিয়ে উঠল।

রণজয় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ!

পুলিশটা তবু চুপ করল না। চৈঁচিয়ে বলল, ভূত! দৈত্য! মেরে ফেলল!

পুলিশটি কোমর থেকে রিভলবারটা বার করতে যেতেই রণজয় সেটা হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল। সেটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর লোকটাকে ভয় দেখাবার জন্য একটা চড় তুলল।

চড় মারবার দরকার হল না। তার আগেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রণজয়ের অদ্ভুত লাগল। একসময় সে-ই পুলিশ দেখলে ভয় পেত। এখন পুলিশই তাকে দেখলে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

রণজয় পুলিশটির জামার বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চিউয়িংগামের প্যাকেট পেয়ে গেল। চারটে রয়েছে তার মধ্যে। কতদিন রণজয় চিউয়িংগাম খায়নি। রণজয় চারটেই একসঙ্গে মুখে পুরে দিল।

সাবধান! এক পা নড়লে গুলি করব!



রণজয় চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখলে আর চারজন পুলিশ এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। একজন পুলিশ চৈঁচিয়ে বলল, ওরে বাবা রে! এ কোন আজব প্রাণী!

রণজয় বলল, আমি মানুষ!

কিন্তু তার গলাটা এমন গম্ভীর আর অন্যরকম হয়ে গেছে যে তার কথা ঠিক বোঝা গেল না। তা ছাড়া মুখে চিউয়িংগাম! সেইজন্য তার কথাটা শোনা গেল যেন, ‘আম্ হুঁস্!’

তার কথা শুনেই দু’জন পুলিশ ভয়ে পিছিয়ে গেল। যার হাতে রিভলবার সে শুধু রণজয়ের কপাল টিপ করে আবার বলল, সাবধান!

রণজয়ের একবার মনে হল, ধরা দেওয়াই ভালো। এইরকমভাবে বনে জঙ্গলে আর কতদিন বা পালিয়ে পালিয়ে থাকা যায়! খাবারদাবার নেই, কথা বলার কেউ নেই।

তারপরেই ভাবল, কিন্তু এরা তাকে ধরে বন্দি করে রাখবে। হয়তো চিড়িয়াখানায় একটা খাঁচায় পুরবে। সে ওরকমভাবে থাকবে কেন? সে তো মানুষ। তার চেহারাটা বদলে গেলেই বা, তার মনটা তো এখনও মানুষের মতন।

তখন তার খুব দুঃখ হল। এইরকমভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়! তার চেহারাটা যে বদলে গেছে, সেটা কি তার দোষ? অন্য কোনও গ্রহ থেকে অভ্যুত সব প্রাণী এসেছিল পৃথিবীতে, তাদের একটা বল ছুঁয়েই তো রণজয়ের এই দশা।

রণজয় দু’হাত ছড়িয়ে পুলিশটির দিকে এগোতে এগোতে বলল, মারুন। গুলি করুন! আমাকে মেরে ফেলুন!

পেছন থেকে আর একজন পুলিশ বলল, সাবধান স্যার! ও গোরিলার মতন এগিয়ে আসছে। খপ করে ধরবে।

যার হাতে রিভলবার, সে কিন্তু তখনও রণজয়কে গুলি করল না। পুলিশের ওপর হুকুম আছে রণজয়কে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাওয়ার। দেশ-বিদেশে রণজয়ের কথা ছড়িয়ে গেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা রণজয়কে পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

সেই পুলিশটি অন্যদের বলল, দড়ি বার করো। একে বাঁধো!

কেউ সাহস করে বাঁধতে এল না।

রণজয় আরও এগিয়ে এসে নিজেই হাত দুটো জোড় করে বলল, না, বাঁধতে হবে না।
আমাকে মেরে ফেলো! আমি বাঁচতে চাই না আর।

কিন্তু রণজয়ের কথা ওরা কেউ বুঝতে পারছে না। মেঘের গর্জনের মতন শোনাচ্ছে।
পুলিশদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

এমন সময় আকাশে একটা কড়কড় শব্দ হল। সবাই ওপরের দিকে তাকাল। একটা
বিরাট গোল বলের মতন জিনিস খুব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসছে। সেটাকে দেখেই
রণজয় লাফিয়ে উঠল। তারপর বলল, সবাই মরবে! পালাও, পালাও!

কথা বলে নিজেই সে ছুটল প্রথমে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঐক্যেবেঁকে। সেই অন্য গ্রহের
প্রাণীরা রণজয়কে ধরতে আসছে।

ওদের হাত থেকে বাঁচবার একটাই উপায় আছে, রণজয় জানে। ওরা জলকে ভয়
পায়। এখান থেকে নদীটা বেশ খানিকটা দূর। রণজয়কে শিগগির সেখানে পৌঁছাতে
হবে।

গোল জিনিসটা খুব কাছে নেমে এসেছে। টর্চের আলোর মতন খুব উজ্জ্বল কয়েকটা
আলোর রেখা তার থেকে নেমে আসছে নীচে। ওই আলোর মধ্যে একবার পড়লে আর
রক্ষে নেই— সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। এর মধ্যেই কয়েকটা গাছ একেবারে
পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

লুকোচুরি খেলার মতন রণজয় ঐক্যেবেঁকে, সামনে পেছনে ঘুরে দৌড়োতে লাগল।
আলোর রেখাগুলো যেন কিছুতেই গায়ে না লাগে। তারপর নদীটার কাছে এসেই দূর
থেকে এক লাফ মারল।

অন্য গ্রহের এইসব প্রাণীরা জল চেনে না, তারা জলের কাছেও আসে না। রণজয় খুব
ভালো সাঁতার জানে। নদীর মধ্যে সে ডুব সাঁতার কেটে কেটে পালাতে লাগল। এখন সে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে থাকতে পারবে।

গোল বলটা এবারও রণজয়কে ধরতে পারল না। কিছুক্ষণ শূন্যে ঘোরাঘুরি করে তারপর আবার মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

মাঝরাাত্রের রণজয় উঠে এল নদী থেকে। এবার তাকে খাবার জোগাড় করতে হবে। রাত্রিবেলা লোকজন ঘুমিয়ে থাকে। এই সময় তবু তার খানিকটা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার সুবিধে আছে।

নদীর পাশেই একটা বাজার। এখন সব দোকান বন্ধ। কয়েকটা দোকানের ভেতরে দোকানদারেরা ঘুমোয়, কয়েকটা দোকান বাইরে থেকে তালা বন্ধ। রণজয় ঘুরে ঘুরে একটা দোকানের সাইনবোর্ড দেখে বুঝল সেটা একটা মিষ্টির দোকান। সে হাত দিয়ে একটু জোরে চাপ দিতেই ভেতর থেকে খিল আর ছিটকিনি ভেঙে পড়ল।

রণজয় দেখল, দোকানের মধ্যে দুটো লোক ঘুমোচ্ছে কিন্তু এই শব্দে তাদের ঘুম ভাঙেনি। সে আর কোনওরকম শব্দ না করে কাচের আলমারি থেকে সন্দেশের থালাটা বার করে নিল। এক থালা সন্দেশ খেয়েও তার পেট ভরল না। তখন সে রসগোল্লার গামলাটাও বার করে আনল। তার নিজেরই অবাক লাগতে লাগল। আগে দুটো-তিনটের বেশি সন্দেশ রসগোল্লা খায়নি কখনও। নেমন্তন্ন বাড়িতেও পাঁচটার বেশি রসগোল্লা খেতে পারেনি কোনওদিন। আর এখন সে কত সহজে এক থালা সন্দেশ আর এক গামলা রসগোল্লা খেয়ে ফেলল। সে কি সত্যিই বকরাক্ষস হয়ে যাবে নাকি?

এইসব খেয়ে তার খুব জল তেষ্ঠা পেল। একটা বালতি ভরতি জল রাখা ছিল। এক চুমুকে খেয়ে ফেলল সবটা। তারপর মিষ্টির দোকানটার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সে চলে এল।

একটা রকের ওপর বসে সে একটুক্ষণ ভাবতে বসল। এরপর কী করা যায়? তাকে পুলিশের লোক ধরতে আসছে, আবার আকাশ থেকে অন্য গ্রহের প্রাণীরাও ধরতে আসছে। সে কতদিন পালিয়ে থাকবে? বনে জঙ্গলে বেশিদিন পালিয়ে থাকা যাবে না। খিদের সময় তার প্রচুর খাবার লাগে। এত খাবার রোজ রোজ সে কীভাবে জোগাড় করবে? নাঃ এভাবে আর চলে না!

সে আবার উঠে দাঁড়াল। সাইনবোর্ড দেখে দেখে সে আবার একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল। এটা একটা জামাকাপড়ের দোকান। বাইরে থেকে তালা দেওয়া। দুটো বড় বড় তালা সে মট মট করে ভেঙে ফেলল। তারপর ভেতরে ঢুকল।

আলমারিতে অনেক তৈরি জামা-প্যান্ট রয়েছে। কিন্তু একটাও তার গায়ে লাগবে না। রণজয় হঠাৎ লম্বা হয়ে যাওয়ায় তার প্যান্টটার তলাটা উঠে আছে হাঁটুর কাছে— জামাটা ছিঁড়েই গেছে। সেই ভিজে জামা প্যান্ট খুলে ফেলে সে একটা ধুতি পরল। সেই ধুতিও তার হাঁটুর বেশি নামে না। আর দুটো চাদর নিয়ে গায়ে জড়াল। আর একটা চাদর দিয়ে পাগড়ি বানিয়ে এমনভাবে মাথায় দিল, যাতে তার মুখের অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়।

দেয়ালের গায়ে একটা আলমারি আছে। রণজয় সেটাকেও ভেঙে ফেলল। তার মধ্যে টাকাপয়সা রয়েছে কিছু। খুব বেশি নয়। রণজয় গুনে দেখল সাতশো পঞ্চাশ টাকা। সব টাকাটাই নিয়ে সে কোমরে গুঁজল।

সে কোনওদিন চুরি ডাকাতি করেনি। কারও দোকান ভেঙে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়া কিংবা ধুতি-চাদর টাকা চুরি করা তার স্বভাব নয়। কিন্তু এখন তার উপায় কী? তাকে বাঁচতে হবে তো। সে তো আর এমনি এমনি মরে যেতে পারে না? ঠিক আছে, যদি পরে আবার সবকিছু বদলে যায়, তা হলে রণজয় নিশ্চয়ই ওই মিষ্টির দোকানদার আর এই জামাকাপড়ের দোকানদারদের সব টাকা ফেরত দিয়ে যাবে।

বাজারে ঢোকার সময়েই সে দেখেছিল, এক জায়গায় দু’-তিনটে সাইকেল চেন দিয়ে বাঁধা আছে। রণজয় সেখানে এসে এক হ্যাঁচকা টানে লোহার চেন ছিঁড়ে ফেলল। তারপর একটা সাইকেল নিয়ে চড়তে গেল।

সে যেই সাইকেলটায় উঠে বসল, অমনি সেটা দুমড়ে বেঁকে পড়ে গেল মাটিতে। তার এত বড় দেহের ভার সাইকেলটা সহ্য করতে পারেনি।

রণজয়ের আবার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। একসময় সে সাইকেল চালাতে খুব ভালোবাসত। আর কি কোনওদিন সে সাইকেল চাপতে পারবে না?

যাই হোক, সাইকেলটা ফেলে রেখে সে হাঁটতে লাগল। বড় রাস্তা ধরে সে খুব জোরে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। মাঝে মাঝে দু’-একটা গাড়ি আসছে— তখন রণজয় রাস্তার পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ছে। গাড়িগুলোকে থামিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ গাড়ির লোকেরা রণজয়কে দেখে হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে, নয়তো পালাবে! রণজয় নিজেও গাড়ি চালাতে জানে না।

প্রায় ভোর হবার একটু আগে রণজয় এসে পৌঁছেল একটা ছোট শহরে। লোকজন উঠে পড়ার আগেই তাকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

সে একটা হোটেল দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটা ছোটখাটো দোতলা হোটেল, দেখে মনে হয় নতুন তৈরি হয়েছে। হোটেলের অফিসঘরে একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার।

রণজয় ঝুঁকে দাঁড়াল, যাতে হঠাৎ না বোঝা যায় সে লম্বা। অন্ধকারে তার গায়ের রংও বোঝা যাবে না। সে লোকটাকে খুব আশ্বে ঠেলা দিয়ে গলার আওয়াজ যতদূর সম্ভব সুরু করে বলল, ঘর পাওয়া যাবে?

লোকটা ঘুমের মধ্যেই বলল, এখন হবে না! এখন হবে না!

রণজয় বলল, আমার খুব দরকার।

লোকটা বলল, সকালে আসবেন। এত রাত্তিরে ঘরভাড়া হয় না!

রণজয় আর কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

অফিসঘরের দেয়ালে একটা কাঠের বোর্ডে কয়েকটা চাবি ঝুলছে! পাশে পাশে লেখা আছে একতলা, দোতলা। রণজয় একটা চাবি তুলে নিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। কয়েকটা ঘরই বাইরে থেকে তালা বন্ধ। দু’-তিনটে তালায় চাবি লাগিয়ে চেষ্টা করতেই একটা তালা খুলে গেল। রণজয় সেই ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে একটা বড় খাট, একটা টেবিল চেয়ার, একটা আয়না। পাশেই বাথরুম।

রণজয় আর একটুও দেরি না করে শুয়ে পড়ল খাটে। উঃ, কতদিন বাদে সে বিছানায় শুচ্ছে! সে ভদ্র পরিবারের ছেলে, লেখাপড়া জানে— সে কেন দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে মাঠে ঘাটে শুয়ে থাকতে যাবে!

বিছানায় শুয়ে তার দারুণ আরাম হল। যদিও খাটটা তার তুলনায় অনেক ছোট, তার পা অনেকখানি বেরিয়ে রইল— তবু সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েক ঘণ্টা বাদে দরজায় খট খট শব্দে তার ঘুম ভাঙল। হোটেলের কোনও লোক তাকে ডাকছে। এবার তো দরজা খুললেই তার চেহারা দেখে ফেলবে।

এক মিনিট চিন্তা করে সে বলল, একটু বাদে। দশ মিনিট ঘুরে এসো—

তার গলার আওয়াজ মোটা হয়ে গেছে, লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে না, তাই সে খুব সাবধানে সরু গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথা বলছে।

এবার সে উঠে দরজার ছিটকিনিটা খুলে রাখল। টেবিলের ওপর রাখল কুড়িটা টাকা। তারপর বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

খানিকটা বাদে আবার একজন কেউ ডাকতে এলে সে বাথরুম থেকেই বলল, টেবিলের ওপর টাকা আছে, ডিম টোস্ট, চা নিয়ে এসো। সারাদিন যেন আমায় কেউ বিরক্ত না করে।

লোকটি যখন চা জলখাবার নিয়ে এল, তখনও রণজয় বাথরুমে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, আর কিছু চাই, আপনার?

রণজয় বলল, হ্যাঁ, একটা খবরের কাগজ!

লোকটি খবরের কাগজও দিয়ে যাবার পর রণজয় বাথরুম থেকে বেরিয়ে জলখাবার খেয়ে নিল। কতদিন পরে যে সে চা খাচ্ছে!

দেয়ালের আয়নায় সে নিজের মুখটা দেখল। নিজেই সে খুব চমকে গেল। প্রতিদিনই চেহারা যেন একটু করে বদলে যাচ্ছে। তার গায়ের নীল রংটা এখন এমন চকচকে যে মনে হয় যেন তেল মাখা। হাত দিলে লেগে যাবে। রণজয় নিজের কপালে হাত বুলোল।

হাতে রং লাগে না অবশ্য। মানুষের চোখের যে সাদা অংশটুকু থাকে, সেটুকুও যেন নীল হয়ে আসছে। রণজয় নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেল, অন্য লোক তো পাবেই।

দরজা জানালা বন্ধ করে রণজয় আবার খবরের কাগজটা নিয়ে শুয়ে পড়ল। খবরের কাগজের বেশির ভাগ খবরই তার সম্পর্কে। কালকের পুলিশের দল যে তার দেখা পেয়েও তাকে ধরতে পারেনি, সে খবরও বেরিয়েছে। একজন পুলিশের লোক নাকি এখনও কোনও কথা বলতে পারছে না। মহাকাশ থেকে যে একটা বিরাট গোল জিনিস মাঝে মাঝে নেমে আসছে— সে কথাও আছে। সেই গোল জিনিসটার ওপর একবার কামানের গোলা চালানো হয়েছিল, তাও সেটার কিছুই হয়নি।

আর এক জায়গায় লিখেছে যে রাশিয়া আর আমেরিকা থেকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এসেছেন তার খোঁজে। তাঁরা এখনও সব কথা বিশ্বাস করছেন না। তাঁরা বলছেন, এরকম নীল রঙের মানুষ হতেই পারে না। তা ছাড়া তার কোনও ছবি পর্যন্ত নেই। এক-একজন এক-এক রকম কথা বলছে। কেউ বলছে, নীল মানুষের দাঁতগুলো মুলোর মতন, কেউ বলছে মুখটা শুয়োরের মতন এইসব। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন তাঁরা এই নীল মানুষকে ধরতে পারলে হুস্টনের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন।

সন্দের দিকে রণজয় সব ঠিক করে ফেলল। সে ধরা দেবে। অনেকদিন থেকেই তার শখ ছিল বিদেশে বেড়াতে যাবার। এইভাবে তো সে সহজেই রাশিয়া-আমেরিকা যেতে পারে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিকরা যদি তাকে আবার সারিয়ে দিতে পারে— তাকে আবার সাধারণ মানুষ করে দিতে পারে, তা হলে তো দারুণ হবে! তা হলে রণজয় আবার নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে!

টেবিলের ড্রয়ারে কয়েকটা কাগজ আর একটা পেনসিল ছিল। তাতে রণজয় একটা চিঠি লিখে ফেলল। চিঠিটা এইরকম:

পুলিশের বড়বাবু মহাশয়,

আপনারা যে নীল মানুষের খোঁজ করছেন, আমি সেই নীল মানুষ। কোনও এক অদ্ভুত কারণে আমি হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে গেছি, আর আমার গায়ের রং একেবারে নীল হয়ে গেছে। কিন্তু আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এখনও মানুষ আছি। আমি মানুষই থাকতে চাই, আমি দৈত্য হতে চাই না। আমি বৈজ্ঞানিকদের কাছে যেতে রাজি আছি। কিন্তু আমি লোকের সামনে বেরুতে পারি না, সবাই আমাকে দেখলেই ভয় পায়। কিন্তু আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি কারুকে মারব না। আমি কারুকে কামড়াই না। বৈজ্ঞানিকদের কাছে গিয়ে আমি সব কথা বলব।

আমি এখন এই আদর্শ হোটেলের ১২ নম্বর ঘরে আছি। আপনি কয়েকজন পুলিশ নিয়ে এসে আমাকে সঙ্গ করে নিয়ে যান। খুব সাহসী দেখে লোকদের আনবেন। আর তাদের আগেই বলে দেবেন, আমাকে দেখে ভয় লাগলেও আমি কারু কোনও ক্ষতি করব না।

আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকব। আজই যে-কোনও সময় আসুন।

ইতি—

নীল মানুষ

চিঠিখানা ভাঁজ করে তার ওপর একটা দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রাখল রণজয়। তারপর সন্কেবেলা যখন হোটেলের বেয়ারা জিজ্ঞেস করতে এল যে তার রান্টিরে কী খাবার লাগবে, তখন রণজয় আবার বাথরুমে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে বলল, রান্টিরে ভাত আর মাংস আনবে। তার আগে এক কাজ করো তো! টেবিলের ওপর যে চিঠিটা আছে, সেটা থানার বড়বাবুকে এফুনি দিয়ে এসো। খুব জরুরি। এ দশ টাকা তোমার বখশিশ।

বেয়ারা চিঠিখানা নিয়ে চলে গেল। তখনও রণজয় বাথরুম থেকে বেরোয়নি, অমনি আকাশে ঝড়ঝড় শব্দ শুনল। বাথরুমের জানলা দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখল আকাশ থেকে সেইরকম গোল বল নেমে আসছে— এবার একটা নয় দুটো।

রণজয় যেখানেই পালাক, কী করে ওরা ঠিক টের পেয়ে যায়! ওরা কি এই হোটেলের ঘর থেকে রণজয়কে ধরতে পারবে?

শব্দ শুনেই রণজয় টের পেল গোল জিনিস দুটো এখন ঠিক হোটেলের মাথার ওপর এসেছে। ওদের কাছে যেরকম আগুনে-আলো আছে, তাতে এই হোটেল বাড়টাকে ওরা এক নিমেষে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। এখন উপায়?

রণজয়ের মনে পড়ল, হোটেলে আসবার আগে সে লক্ষ করেছিল, এই বাড়টার ঠিক পেছনেই একটা পুকুর আছে। ওদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় সেই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া।

রণজয় বুঝতে পারল, হোটেলের এই ঘরে আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। ওরা যখন এই হোটেল পর্যন্ত চিনে আসতে পেরেছে, আজ এই ঘরেও আসবে।

রণজয় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের বেয়ারাটা ঠিক সেই সময় সেদিকে আসছিল, সে হঠাৎ দেখতে পেয়ে চৈচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে! একী!

রণজয় গ্রাহ্য করল না। সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের পেছন দিকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরে।

এবারে সেই গোল বল দুটি পুকুরের ওপরে এসে ঘুরতে লাগল। তারপর দুটোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটো নীল আলোর শিখা। সেই আলো পড়ামাত্র পুকুরের জল টগবগ করে ফুটতে লাগল।

রণজয় একটা জিনিস জানে। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলো তাকে ঠিক মারতে চায় না। এরাও তাকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। এবার তারা রণজয়কে জলের মধ্য থেকেও ধরে আনার কায়দা শিখে এসেছে।

হোটেলের অনেক লোকও শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে— কিন্তু তারা কেউ কাছে আসতে পারছে না। তাদের সাংঘাতিক গরম লাগছে।

রণজয় দেখল, নীল আলোতে পুকুরের জল আন্তে আন্তে ধোঁয়া হয়ে চলে যাচ্ছে।

একটু বাদেই পুকুরের সবটা জল শুকিয়ে গেল। পুকুরের মাছগুলো কাদায় ছটফট করছে। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে রণজয়। তার আর পালাবার উপায় নেই। কয়েকটা আলো বারবার তার চার পাশে ঘুরছে। সেই আলো পেরুতে গেলেই গা পুড়ে যাবে।

একটা গোল বলের দরজা খুলে গেল। তার মধ্য থেকে চারজন নীল রঙের প্রাণী নেমে এল রণজয়ের কাছে। তাদের চেহারা মানুষেরই মতন, কিন্তু মাথায় কোনও চুল নেই, ভুরু নেই। তারা রণজয়কে চেপে ধরে তুলে নিয়ে গেল। পরের মুহূর্তেই ওদের নিয়ে গোল বল দুটো সাঁ করে উড়ে গেল আকাশে।

রণজয়ের হাত যারা চেপে ধরে আছে, তাদের হাত লোহার মতন শক্ত। রণজয় বুঝল, টানাটানি করে লাভ নেই। ভেতরে ঢুকেও তারা রণজয়কে তুলোর মতন নরম কিছু একটা জিনিসের ওপর বসিয়ে হাত চেপে ধরেই রইল। এরা কেউ কোনও কথা বলে না। শুধু এক-একবার এক-একজন অন্য কারও চোখের দিকে তাকায়। তাতেই কথা হয়ে যায়।

গোল জিনিসটার ভেতর থেকে বসে বাইরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। রণজয় দেখল, সেটা সাঁ সাঁ করে ক্রমেই অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। নীচে এখনও পৃথিবীকে দেখা যায়— কিন্তু এর মধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে, একটু পরে আর দেখা যাবে না!

পৃথিবীর লোক রণজয়কে ধরতে পারল না, তার আগেই এরা তাকে চুরি করে নিয়ে গেল। আর কি কোনওদিন সে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে! এত সুন্দর পৃথিবী, একে ছেড়ে কি যেতে ইচ্ছে হয়! রণজয়ের বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হতে লাগল।

হঠাৎ একজন প্রহরী গোঁ গোঁ শব্দ করে রণজয়ের হাত ছেড়ে দিল। সে উঠে প্রায় লাফাতে লাগল আর একটা হাত নাড়তে লাগল মুখের সামনে। বোঝা গেল, তার হাতটায় সাংঘাতিক যন্ত্রণা হচ্ছে। কী করে এমন হল? রণজয় নিজেই বুঝতে পারল না প্রথমে।

অন্যরাও এসে ওই লোকটির হাতটা পরীক্ষা করতে লাগল। লোকটির হাতের এক জায়গায় একটা গোল গর্ত মতন হয়ে গেছে, যেন আঙুলে পুড়ে গেছে। লোকটি আঙুল

দিয়ে রণজয়ের দিকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে লোকটা রণজয়কে ধরে ছিল, সেও যেন ভয় পেয়ে হাত ছেড়ে দিল।

রণজয় এবার বুঝল। তার কান্না এসে গিয়েছিল, সেই চোখের জল এক ফোঁটা এ লোকটার হাতে পড়েছে। তাতেই এই কাণ্ড? ওরা জল সহ্য করতে পারে না। সামান্য জলের ছোঁয়াতেই ওদের এইরকম কষ্ট হয়?

এখন রণজয়কে ওরা কেউ ধরে নেই। এখন সে ইচ্ছে করলে লাফিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এই মহাশূন্যে সে কোথায় লাফিয়ে পড়বে? তাকে ওদের সঙ্গেই যেতে হবে। ওরা কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। এখন চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

তবু, রণজয় টের পেল, তার কাছে একটা অস্ত্র আছে। চোখের জল। চোখের জলকেও যে কেউ এত ভয় পেতে পারে, রণজয় আগে সে কথা স্বপ্নেও ভাবেনি।

নীল মানুষের দেশে

রণজয় বুঝতে পারল, তার আর এখন মুক্তি পাবার কোনও উপায় নেই। সে পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। সে বসে আছে একটা গোল মতন রকেটের মধ্যে। এখন যদি সে জোর করে এই রকেট থেকে লাফিয়েও পড়ে, তা হলেও সে আর কোনওদিন পৃথিবীতে পৌঁছোতে পারবে না, তার দেহটা মহাশূন্যে ঝুলবে।

রকেটের মধ্যে যে প্রহরীরা তাকে ঘিরে আছে, তারা কিন্তু আকাশে উড়তে পারে। রণজয় আগে দেখেছে যে তারা এই গোল রকেট থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ উড়তে উড়তে ভেসে থাকে, আবার ফিরে আসে রকেটের মধ্যে। অর্থাৎ ওরা মাধ্যাকর্ষণ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু রণজয় তো উড়তে পারবে না, কারণ সে মানুষ।

রণজয় যদিও মানুষ, কিন্তু এখন আর তাকে মানুষের মতন দেখতে নেই। একদিন সকালবেলা সে মাছ ধরতে গিয়ে দেখেছিল, জলে একটা চকচকে গোল জিনিস ভাসছে। রণজয় সাঁতরে গিয়ে সেটা তুলে নিয়েছিল। ইস, কেন যে সেটা সেদিন নিয়েছিল রণজয়! সেটা ছোঁবার পর থেকেই তার চেহারা হয়ে গেছে দৈত্যের মতন, সে লম্বায় প্রায় সাড়ে সাত ফুট এখন। তার গায়ের রং নীল, মাথায় চুল, এমনকী চোখের ভেতরটাও নীল। এখন তার মা-ও তাকে দেখলে চিনতে পারবেন না।

রণজয়কে যারা বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদেরও গায়ের রং নীল। কিন্তু তাদের মাথায় চুল নেই, ভুরু নেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, ওদের কখনও দাড়ি গোঁফ হয় না। ওদের

চোখের পাতাও নেই বলে এমনভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যে দেখলেই গা হুমহুম করে।

রণজয় ওদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না, ধরা পড়ে গেল। যে-কোনও জায়গায় লুকোলেও ওরা ঠিক খুঁজে বার করে।

এরা কিন্তু রণজয়কে মেরে ফেলতে চায় না। ইচ্ছে করলে, অনেক আগেই মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু ওরা চায় রণজয়কে ধরে নিতে যেতে। কেন? ওরা তাকে নিয়ে কী করবে?

ওদের কাছে বন্দুক পিস্তলের মতন কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই। কয়েকজনের হাতে রয়েছে টর্চ। সেই টর্চ দিয়ে বেরোয় নীল রঙের আলো, তাতে যে-কোনও জিনিসই এক মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

রণজয়ের কাছে কোনও অস্ত্র নেই, তবু তাকে ওরা ভয় পাচ্ছে। কেউ আর কাছে আসছে না। কারণ এই প্রাণীগুলোর চেহারা মানুষের মতন হলেও এরা জল সহ্য করতে পারে না। একটু আগে রণজয় যখন মন খারাপ করে বসে ছিল, সেই সময় ওর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল একজন প্রহরীর হাতে পড়তেই সে টেঁচিয়ে উঠেছিল ভয় পেয়ে। সেই এক ফোঁটা চোখের জলেই ওর হাতে একটা গর্ত হয়ে গেল। ঠিক যেন এক ফোঁটা গরম লোহার মতন।

লোকগুলো একদৃষ্টে দেখছে তাকে। নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছে, রণজয় কী করে চোখের মধ্যে এরকম অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে। ওরা কাঁদে না। ওদের হাসতেও দেখেনি রণজয়।

রকেটটা ছুটে চলেছে, কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে! একটুও কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। বাইরে আকাশে কোনও মেঘ নেই, হাওয়া নেই, কিছু নেই। তাই মনে হয় রকেটটাও যেন থেমে আছে।

খানিকটা বাদে দেখা গেল, বহু দূরের আকাশে একটা সোনার থালা। রণজয় অবাক

হয়ে গেল। ওটা কী? ক্রমশই সেই থালাটা বড় হতে লাগল। আরও কাছে আসবার পর রণজয় দেখল, সেটা থালা নয়, সেটা একটা পাথরের তৈরি গোলমতন জিনিস। আর একটু কাছে যাবার পর রণজয় বুঝতে পারল, সেটা একটা গ্রহ। কোথা থেকে রোদ্দুর পড়ে সেটাকে দারুণ চকচকে দেখাচ্ছে। তা হলে কি ওইটাই চাঁদ? রণজয়রা চাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে?

সে উত্তেজিত ভাবে বলে ফেলল, ওটা কী? ওটা চাঁদ?

লোকগুলো কোনও উত্তর দিল না। এরা নিজেদের মধ্যে খুব নিচু গলায় কিচিরমিচির করে কথা বলে। রণজয় তার একবর্ণও বুঝতে পারে না। এদের মধ্যে একজন আছে, যে ঠিক রণজয়ের সমান লম্বা। বাকিরা এমনি সাধারণ মানুষের মতন। সেই লম্বা লোকটিই বোধহয় ওদের দলপতি। সে-ই শুধু রণজয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে। মুখে কিছু বলে না, শুধু রণজয়ের চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। তাতেই মনে মনে কথা শুরু হয়ে যায়।

সেই লম্বা লোকটি এখন হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে।

তাদের রকেটটা সেই চকচকে গ্রহটা পার হয়ে চলে গেল। তার একটু পরেই বাইরের আকাশ হয়ে গেল একদম অন্ধকার। এমন কুচকুচে কালো অন্ধকার রণজয় কখনও দেখেনি। পৃথিবীতে কোনও জায়গার অন্ধকারই এত গাঢ় নয়। এখন সমস্ত আকাশ যেন কালো রঙের পর্দায় ঢাকা।

আবার কিছুক্ষণ পর সামনের আকাশ চিরে একটা সোনালি রঙের আলোর রেখা এসে পড়ল। এবার কাছে আসতেও দেখা গেল, সেটা কিন্তু কোনও গ্রহ নয়। মাটি, পাথর বা শস্ত কিছুই নেই। যতদূর দেখা যায়, সেই আলোর রেখাটা সোজা চলে গেছে। ঠিক যেন একটা আলোর নদী। তাদের রকেটটা কোনাকুনি ভাবে সেই আলোর নদীটা পার হয়ে চলে গেল।

আবার অন্ধকার। আবার প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে দেখা গেল দূরে একটা কিছু আকাশের

মধ্যে দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে। যেন ওখানে বিরাট কোনও একটা জিনিসে ভীষণ ভাবে আগুন লেগে গেছে। সেই আগুনটা আবার ঘুরছে একটু একটু।

এইসব দেখতে দেখতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল রণজয়।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখল, চারজন প্রহরী ঠিক ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোকটি স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে রণজয়ের দিকে। অমনি রণজয় টের পেল দলপতি তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

দলপতি মুখ দিয়ে কিছু উচ্চারণ করল না। রণজয় তার মাথার মধ্যে টের পেল, সে বলছে, নমস্কার পৃথিবীর মানুষ, এবার আমাদের নামবার সময় এসেছে। এই রকেট একেবারে নীচে নামে না। খানিকটা আমাদের লাফিয়ে নামতে হবে। আপনি ভয় পাবেন না। আপনাকে আমরা ধরে থাকব। কিন্তু একটা অনুরোধ, আপনি চোখ থেকে ওই গরম জিনিসটা বার করবেন না! ওতে আমাদের খুব লাগে। হঠাৎ আপনার হাত ছেড়ে দিলে আপনিই বিপদে পড়বেন।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, আপনারা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

দলপতি বলল, আপনি যদি নিজে ইচ্ছে করে আসতেন, তা হলে আমাদের জোর করার দরকার হত না। আমরা আপনাকে ব্যথা দিয়েছি?

রণজয় বলল, কিন্তু আমি আপনাদের দেশে যাব কেন? আপনারা আমাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবেন?

দলপতি বলল, আপনি আর পৃথিবীর মানুষ নন। আপনি এখন আমাদেরই একজন। আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

রণজয় বলল, না, আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই।

দলপতি দু'বার হাততালি দিল। অমনি দু'জন প্রহরী এসে ধরে ফেলল রণজয়ের দুটো হাত। রণজয়ের ইচ্ছে হল ওদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়। থুতুও জল, সেটা মুখে লাগলেই ওরা যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে রণজয়কে ছেড়ে দেবে।

তারপরই রণজয় বুঝল, এখন এসব করেও কোনও লাভ নেই। বরং দেখাই যাক না, এদের দেশটা কী রকম!

রকেটের একটা দরজা খুলে গেল ফট করে। দু'জন প্রহরী রণজয়ের দু'হাত চেপে ধরে লাফ মারল শূন্যে। তারপর ওরা ভাসতে ভাসতে নামতে লাগল। নীচে তাকাতেই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল রণজয়ের। নীচে, অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট একটা ধুধু করা মাঠ। একবার প্রহরীদের হাত ছেড়ে গেলে রণজয় নীচে পড়ে গিয়ে একেবারে ছাতু হয়ে যাবে!

আরও অনেকটা নেমে আসবার পর রণজয় ভয়ে ভয়ে আর একবার নীচে তাকাল। এবার দেখা যাচ্ছে শুধু ধুলোর মেঘ। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন ধুলো উড়ছে। প্রহরী দু'জন এক হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিল। সেই দেখাদেখি চোখ বুজে ফেলল রণজয়।

একটু পরেই তারা নরম ধুলোর গদির ওপর নামল। অত উঁচু থেকে পড়ার পরও ওদের একটুও লাগল না। প্রায় কোমর পর্যন্ত ধুলো, তার মধ্যে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রণজয় দেখল, যত দূর দেখা যায়, শুধু এইরকম ধুলো, কোথাও বাড়ি, ঘর, গাছপালা কিছুই নেই। এ কোথায় তাকে নিয়ে এল এরা? এখানে ওরা থাকে কী করে? রকেটটা নীচে নামল না কেন? তা হলে কি এই গ্রহে ওরা থাকে না।

রকেটের অন্য লোকেরাও কাছেই এসে পড়ল ওপর থেকে। ওদের দলপতি কিছু একটা হুকুম দিতেই সবাই সেই ধুলোর মধ্য দিয়ে চলতে লাগল আবার। এত ধুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটলেও ধুলোগুলো কিন্তু গায় লাগছে না। গা থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। বরফের মধ্য দিয়ে হাঁটলে যেমন গা ভেজে না।

বেশি দূর যেতে হল না। হঠাৎ এক জায়গায় দলপতি হাত তুলতেই ওরা থেমে গেল। একজন প্রহরী বসে পড়ল ধুলোর মধ্যে। তারপরই একটা বিশাল ঢাকনা খুলে গেল, দেখা গেল নীচের দিকে একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে এসে ওরা দাঁড়াতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল ঢাকনাটা।

সিঁড়িতে পা দিতেই দারুণ আলোতে প্রথমটায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রণজয়ের। অনেক তলা থেকে আসছে আলো, কিন্তু একটা গোলমালও শোনা যাচ্ছে।

প্রায় একশো ধাপ সিঁড়ির নীচে অদ্ভুত সুন্দর একটা শহর। চওড়া চওড়া রাস্তা, পাশে পাশে সব এক রকমের বাড়ি। প্রত্যেকটি বাড়িই গোল, ঠিক ওদের রকেটগুলোরই মতন। রাস্তায় মাঝে মাঝে বসানো রয়েছে গোল গোল আলো। এখানে কোনও চৌকো কিংবা লম্বা জিনিস নেই।

রাস্তা দিয়ে অনেক লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। তারা ওদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে হইহই করে ছুটে এল। এখানকার সব লোকের গায়ের রং নীল। ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা করে চিনতে পারা যায় না, কারণ কারওই মাথায় চুল নেই। চোখে ভুরু নেই, দাড়ি গোঁফ নেই।

ওরা ছুটে এসে রণজয়কে ঘিরে দাঁড়াল। রণজয়ের খালি গা আর মাথা ভরতি চুল, সেই দেখেই ওরা অবাক হয়েছে। ওদের সকলের গায় অ্যানুমিনিয়ামের পাতের তৈরি চকচকে জামা।

ক্রমশই ভিড় বাড়তে লাগল। কেউ কেউ রণজয়ের মাথার চুল ছুঁয়ে দেখবার চেষ্টা করল আর কেউ বা হাত বুলোতে লাগল রণজয়ের বুকে-পিঠে। প্রায় একটা ধাক্কাধাক্কি লেগে যেতেই সেই লম্বা মতন দলপতি খুব জোরে হাততালি দিয়ে উঠল।

অমনি রাস্তার অনেক দূরে আর একজন কার হাততালির শব্দ শোনা গেল। তারপর সারা গায়ে বর্মপরা দু'জন লোক ছুটে এল, তাদের হাতে দুটো গোল ফুটবলের মতন যন্ত্র। লোক দুটো ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিল সেই যন্ত্র দুটো আর তার থেকে হাওয়া বেরুতে লাগল অসম্ভব জোরে। দারুণ ঝড়ের মতন হাওয়া— সেই হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে ভিড়ের সব লোক ছিটকে সরে যেতে লাগল। রণজয়ও সামলাতে পারল না, সেও চিত হয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপরে।

একটু পরে হাওয়া থেমে যেতেই বর্মপরা লোক দুটি হাত ধরে টেনে তুলল রণজয়কে।

একজন কিচিরমিচির করে কী যেন জিজ্ঞেস করল। রণজয় তার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না। তখন সেই লোক দুটোই হাত বুলোতে লাগল রণজয়ের গায়ে আর মাথার চুলে। তখন সেই লম্বা দলপতি এসে ওদের কী যেন বোঝাল।

এবার সবাই মিলে রণজয়কে টানতে টানতে নিয়ে চলল সামনের দিকে। রণজয় বাধা দিল না। তার মনটা হঠাৎ খুব দমে গেছে। সে বুঝে গেছে যে সে এখানে একা একা কিছু করতে পারবে না। এরা বিজ্ঞানে অনেক উন্নত। সামান্য একটা ফুটবলের মতন যন্ত্র থেকে এমন হাওয়া বেরুল যে সে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারল না। এরকম যন্ত্র ওদের আরও কত আছে কে জানে। সে আর কোনওদিন পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না? তাকে এখানেই থাকতে হবে?

ওরা এসে থামল একটা বড় গোল বাড়ির সামনে। সে বাড়ির দরজা গোল, জানলাও সব গোল। এদের সব কিছুই গোল? বাড়ির ভেতরে ঢোকানো রাস্তাটা একটা সুড়ঙ্গের মতন। তার ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশের অনেকগুলো ঘর পার হয়ে যাবার পর ওরা এসে পৌঁছোল বাড়িটার পেছন দিকে। তারপর খোলা মাঠ। একটু দূরে সেই মাঠের মধ্যে একটা আলাদা গোল ঘর। ওরা রণজয়কে সেই ঘরে নিয়ে এল। ঘরের মধ্যে মস্ত বড় একটা গোল পাথরের টেবিল, সেটাই আসলে শোওয়ার খাট। তার ওপর বিছানা পাতা।

দলপতি রণজয়ের সামনে এসে আবার মনে মনে কথা বলতে লাগল।

দলপতি বলল, পৃথিবীর মানুষ, আপনি এই ঘরে থাকবেন। একটু পরেই আপনার খাবার এনে দেওয়া হবে। আপনার হঠাৎ কিছু দরকার হলে জোরে হাততালি দেবেন।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, আমি কি বন্দি?

কেন আপনি বন্দি হবেন? আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। তবে একলা একলা বেশি দূর যাবেন না, রাস্তা হারিয়ে ফেলবেন।

আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই!

বলেছি তো, তার কোনও উপায় নেই। চিন্তা করছেন কেন? দেখবেন, ক’দিন বাদে এই জায়গাটাই আপনার বেশি ভালো লেগে যাবে। এই জায়গাটা পৃথিবীর চেয়ে অনেক ভালো!

হোক ভালো! তবু আমি পৃথিবীতেই ফিরে যেতে চাই।

দলপতি আর কিছু না বলে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাকি লোকগুলোও চলে গেল তার সঙ্গে। ওরা দরজা বন্ধ করল না।

খানিকটা বাদে রণজয় বাইরে একটু উঁকি দিয়ে দেখল, কোনও পাহারাদারও নেই সেখানে। বোধহয় সে ইচ্ছে করলে এখন এক ছুটে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যাবে কোথায়? এখান থেকে তো আর সে পৃথিবীতে পালিয়ে যেতে পারবে না!

নিরাশ হয়ে সে বিছানার ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রণজয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল একটা মিষ্টি বাজনার শব্দে। টুং টাং করে একটা বাজনা বাজছে। বাজনাটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে এল। তারপর তার ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। মেয়েটির গা থেকেই ওরকম টুং টাং আওয়াজ বেরুচ্ছে। মেয়েটির গায়ের রংও নীল, তার পোশাক অ্যালুমিনিয়ামের মতন চকচকে সাদা। তার মাথায় চুল না থাকলেও, সুন্দর একটা সাদা রঙের মুকুট পরে আছে সে।

মেয়েটির হাতে একটা থালায় ভরতি খাবার। হাসিহাসি মুখে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে খাবারের থালাটা নামিয়ে রাখল বিছানার ওপরেই। তারপর সে সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল বাজনার সঙ্গে সঙ্গে।

একটু বাদে সে নাচ থামিয়ে রণজয়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রণজয় বলল, আমার জল চাই। জল ছাড়া খাবার খাব কী করে?

মেয়েটি কোনও কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

রণজয় আবার বলল, আমার এক গেলাস জল চাই!

মেয়েটি কথা না বলে আবার নাচতে লাগল।

রণজয় ভাবল, কী মুশকিল! মেয়েটা বোবা নাকি? শুধু নাচ দেখলে তেষ্ঠা মিটবে? এ নিশ্চয়ই তার কথাও বুঝতে পারছে না! সে একটা হাত মুখের কাছে এনে জল খাওয়ার ভঙ্গি করল। মেয়েটি তা দেখে হাসতে লাগল মুচকি মুচকি!

রণজয়ের রাগ হয়ে গেল। সে চৈঁচিয়ে বলল, নাচ থামাও! মেয়েটি তবু থামছে না। রণজয় উঠে গিয়ে মেয়েটির হাত চেপে ধরল। অমনি মেয়েটির সারা গা থেকে খুব জোরে টুং টাং টুং টাং শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

রণজয় দারুণ অবাক হয়ে গেছে! মেয়েটি সত্যিকারের মেয়ে নয়। একটা পুতুল, এর ভেতরে কোনও যন্ত্র বসানো আছে। একটু দূর থেকে একদম বোঝাই যায় না। রণজয় ওর হাত ছেড়ে দিতেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। একজন মানুষের মতন।

রণজয় এবার খাবারগুলো দেখল। কয়েকটা গোল গোল পুডিং-এর মতন রয়েছে। আর কয়েকটা মাংসের চপ। কিন্তু জল ছাড়া এগুলো খাবে কী করে? তখন রণজয়ের মনে পড়ল, এরা তো জলকে ভয় পায়। এদের এখানে বোধহয় জলই নেই। সর্বনাশ! রণজয় তা হলে এখানে বাঁচবে কী করে? মানুষ তো জল ছাড়া বাঁচে না! খিদের চোটে রণজয় খাবারগুলো খেয়ে নিল। সেগুলোর স্বাদ মন্দ নয়। তবে কেমন যেন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ আছে। জল তেষ্ঠায় রণজয় ছটফট করতে লাগল।

লম্বা দলপতি বলেছিল কিছু দরকার হলে হাততালি দিতে। সে জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। অমনি আবার টুং টাং শব্দ করতে করতে ফিরে এল সেই পুতুল মেয়েটা। তার হাতে আর এক থালা খাবার। এরা বুঝি ভেবেছে, তার পেট ভরেনি, আরও খাবার চাই।

সে চিৎকার করে বলে উঠল, জল!

মেয়েটি খাবারের থালাটা রাখল বিছানার ওপর। তারপর আবার নাচতে লাগল। রণজয়ের এত রাগ হল যে থালাটা তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল বাইরে। ঝনঝন করে আওয়াজ হল। মেয়েটিও অমনি ছুটে পালিয়ে গেল।

এমনি করে কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন। জল তেঁষ্টায় রণজয় অবশ্য মরে যায়নি। এখানে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়। সকালে বিকেলে দু'বার করে হঠাৎ মেঘ ডাকার শব্দ হয় খুব জোরে। তখন সব লোকজন হইহই করে বেরিয়ে আসে বাইরে। তখন ওপর থেকে বৃষ্টি পড়ে। সে এক মজার বৃষ্টি। ঠিক মেঘ ডাকার মতন শব্দ হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, তারপর বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সে বৃষ্টিতে জল নেই, শুধু আলো। ঠিক বৃষ্টির মতন দেখতে নীল নীল আলোর শিখা নেমে আসে ওপর থেকে। সবাই বৃষ্টিতে ভেজার মতন সেই আলোতে ভেজে। তাতেই কিন্তু রণজয়ের জলতেঁষ্টা কমে গেল।

রণজয় একা একা অনেক দূর ঘুরে বেড়িয়েছে এর মধ্যে। এদের এখানে আর সবই আছে, কিন্তু একটাও গাছপালা নেই আর পুকুর বা নদী নেই। গোটা দেশটাই মাটির নীচে। এই গ্রহে যদি অন্য গ্রহ থেকে কোনও মানুষ বা প্রাণী আসে, তা হলে বুঝতেই পারবে না যে এখানে কোনও জীবিত প্রাণী আছে। ওপরের ধুলো ভরা মাঠ দেখেই ফিরে যাবে। আর মাটির নীচে বাড়ি, ঘর, রাস্তা, দোকান সবই আছে। এখানকার সব মানুষের চেহারা এক রকম। তবে কেউ কেউ একটু বেশি লম্বা। এখানে ঝি, চাকর বা রান্নার ঠাকুর নেই। সেসব কাজ করে ওই পুতুলের মতন যন্ত্র। এমনকী ওই যন্ত্র-পুতুলরা রোজ দু'বেলা রাস্তা পরিষ্কার করে যায়।

এরপর একদিন সেই লম্বা দলপতি আর কয়েকজন নীল মানুষকে সঙ্গে করে এল রণজয়ের ঘরে। দলপতি রণজয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন লাগছে আপনার?

রণজয় বলল, খুব খারাপ!

লোকটি চমকে গিয়ে বললে, কেন? আপনার কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে? আপনি এখানে যা চান, তাই পাবেন। আপনি আর কী চান বলুন।

রণজয় বলল, আমি কিছু চাই না। যে দেশে আকাশ নেই, নদী নেই, গাছ নেই, দিন নেই, রাত্তির নেই, সেখানে আমি থাকতে চাই না। আমাকে শুধু পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।

দলপতি বলল, তা আর হয় না। এখন চলুন আমাদের সঙ্গে।

কোথায়?

আমাদের লেবরেটরিতে। সেখানে আপনাকে পরীক্ষা করা হবে।

আমি যাব না!

তা হলে আপনাকে জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

দলপতির ইঙ্গিত পেয়ে তিন-চারজন এসে রণজয়কে চেপে ধরলে। রণজয় একবার ভাবল, দেখি তো, এদের গায়ের জোর কেমন! সে খুব জোরে একটা ঝটকা মারতেই দু’-তিনজন নীল মানুষ ছটকে পড়ে গেল। এমনকী সেই লম্বা দলপতি এগিয়ে আসতেই রণজয় তার মুখে এমন জোরে একটা ঘুষি কষাল যে সেও পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। রণজয় নিজেই খুব অবাক হয়ে গেল। তার গায়ের জোর যেন আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে।

রণজয়ের হাতে মার খেয়ে লোকগুলো খানিকটা যেন ভয় পেয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। দলপতি এবার তার পকেট থেকে একটা ক্যান্সিশের বলের মতন ছোট গোল যন্ত্র বার করল। তারপর বলল, আমরা দুঃখিত, আপনি আমাদের কথা শুনলেন না। এবার এই যন্ত্রটা ব্যবহার করতে বাধ্য হব!

রণজয় ওদের এই যন্ত্রগুলোকে খুব ভয় পায়। এটার মধ্যে আবার কী আছে কে জানে! সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। আমি আপনাদের সঙ্গে শুধু একটু খেলা করছিলাম।

বাইরে মাঠের মধ্যে একটা গোল গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেটার মধ্যে উঠে বসতেই সেটা বোঁ করে খুব জোরে ছুটতে লাগল। রণজয় বাইরে তাকিয়ে রইল। এখানে সব কিছুই গোল আর নীল রং ছাড়া কোনও রং নেই— এ দেখতে দেখতে যেন চোখ পচে যায়। এখানে সকাল সন্ধেও নেই। সব সময় একই রকম আলো থাকে— যার যখন ইচ্ছে ঘুমোয়।

অনেকক্ষণ পরে ওরা এসে দাঁড়াল একটা ফাঁকা জায়গায়। মাঠের মধ্যে শুধু একটা গোল টিবি মতন রয়েছে। দলপতি সেখানে গিয়ে একটুক্ষণ খুঁটখাট করতেই মাটির ওপর খুলে গেল একটা দরজা। সেখান দিয়ে নেমে গেছে একটা সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ি দিয়ে অনেকখানি নীচে নেমে এসে রণজয় অবাক স্তম্ভিত হয়ে গেল। এখানেও রয়েছে রাস্তা, বাড়ি ঘর। ঠিক ওপরের মতন, অর্থাৎ এদের দেশটা দোতলা। ওপরে যেমন একটা শহর আছে, নীচেও ঠিক তেমনি শহর আছে আর একটা। এরপর আরও নীচে কিছু আছে কিনা কে জানে!

এখানে রণজয়কে নিয়ে আসা হল বাগানের মতন একটা জায়গায়। বাগান মানে কী, গাছ টাছ কিছু নেই। কিন্তু গোল একটা জায়গায় এখানে ওখানে ছোট ছোট বাল্ব দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে দেখে মনে হয় ফুলগাছ। আর ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা আলোর ফোয়ারা। তাতে একটুও জল নেই, কিন্তু মনে হয় জলের মতন।

সেখানে একটা পাথরের টুলের ওপর বসানো হল রণজয়কে। অন্য রক্ষীরা সবাই চলে গেল, শুধু রইল সেই লম্বা দলপতি। তারপর চারদিক থেকে টুং টাং টুং টাং শব্দ হতে লাগল। রণজয় দেখল, অনেকগুলি খুব সুন্দর মেয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। কিন্তু রণজয় জানে, ওরা সবাই পুতুল। সেই পুতুলগুলো গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল রণজয়কে। তারপর এল আরও তিনজন লম্বা লোক। এরা দাঁড়াল খানিকটা দূরে।

তাদের একজনের চোখে চোখ পড়তেই রণজয় বুঝতে পারল, সেই লোকটি ওর সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে চাইছে। এদের সব লোক এরকম ভাবে কথা বলতে পারে না।

সেই লোকটি বলল, পৃথিবীর মানুষ, আশা করি ভালো আছেন?

রণজয় বলল, না ভালো নেই। আমাকে কেন জোর করে ধরে এনেছেন?

লোকটি বলল, আপনাকে ধরে এনেছি কয়েকটি পরীক্ষা করার জন্যে।

রণজয় বলল, আমাকে নিয়ে পরীক্ষা করবেন? আমি কি গিনিপিগ না খরগোশ? আমি তো মানুষ!

লোকটি একটুক্ষণ কিছু বলল না। বোধহয় সে জানেই না যে গিনিপিগ আর খরগোশ কাকে বলে। তারপর আবার বলল, শুনেছি, আপনার চোখ দিয়ে জল পড়ে। সেই জল নাকি সাংঘাতিক গরম, তাতে আমাদের হাত পুড়ে যায়। সেরকম কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলুন তো, আমরা পরীক্ষা করে দেখব!

এবার রণজয়ের একটু হাসি পেয়ে গেল। কেউ চোখের জল ফেলতে বললেই ফেলা যায় নাকি? এরা কিছুই জানে না!

সে বলল, আপনারা বললেই আমি চোখের জল ফেলব কেন?

লোকটি বলল, কারণ নিশ্চয়ই আছে।

রণজয় বলল, সে আপনাদের যাই কারণ থাক। আমি তা মানতে বাধ্য নই।

এবার লোকটি হাততালি দিয়ে উঠল। অমনি একটা মেয়ে-পুতুল নাচতে নাচতে এগিয়ে এল তার দিকে। তার হাতে একটা চকচকে গোল অ্যালুমিনিয়ামের প্লেট। রণজয় একটু ভয় পেয়ে গেল। এটা নিশ্চয়ই আর একটা যন্ত্র। ওরা তাকে শাস্তি দিতে আসছে!

মেয়ে-পুতুলটি সেই প্লেটটা রণজয়ের চোখের সামনে ধরল। রণজয় দেখল, তাতে একটা ছবি আঁকা আছে। একজন মানুষের ছবি। এর গায়ের রং নীল। কিন্তু মাথায় চুল আছে, চোখের ওপর ভুরু আছে। সেটা যেন রণজয়েরই ছবি।

রণজয় অবাক হয়ে সেই লম্বা লোকটির দিকে আবার তাকাতেই সে বলল, এই ছবিটা দেখলেন? ওটা আমাদের এক পূর্বপুরুষের ছবি। অনেকটা আপনারই মতন না? তার মানে একসময় আমরাও আপনাদের মতনই দেখতে ছিলাম। আমাদের মাথায় চুল থাকত, চোখ দিয়ে জল পড়ত। এখন এখানকার মানুষেরা জল কাকে বলে তাই-ই জানে না। সেইজন্যই আপনাকে ধরে আনা হয়েছে। আমরা দেখব কী করে মাথায় চুল হয় আর চোখ দিয়ে জল বেরোয়!

রণজয় জিজ্ঞেস করল, পরীক্ষা করবার পর আমাকে ছেড়ে দেবেন? পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবেন?

লোকটি বলল, না, তা আর হয় না! আপনি আর পৃথিবীর মানুষ নন। আপনি এখন আমাদের। পৃথিবীর কথা ভুলে যান।

একথা শুনেই রণজয়ের আবার রাগ ধরে গেল। সে কোনওদিন পৃথিবীর কথা ভুলে যাবে না। যে করেই হোক, সে পৃথিবীতে ফিরবেই।

হঠাৎ সে উঠে ছুটে গিয়ে সামনের পুতুলগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লম্বা লোকটির গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিতে গেল।

কিন্তু রণজয়ের মুখ দিয়ে থুতু বেরুল না। মুখ শুকনো।

এবার সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল রণজয়। কয়েকদিন ধরে সে এক ফোঁটাও জল খায়নি। তাই কি তার মুখ শুকিয়ে গেছে? তা হলে কি আর সে কোনওদিন কাঁদতেও পারবে না? আস্তে আস্তে সে এখানকার মানুষের মতন হয়ে যাবে? তার চুল খসে যাবে, ভুরু ঝরে যাবে?

সে মাথার চুল খিমচে ধরল। অমনি তার হাতে উঠে এল এক গোছা চুল। ভয়ে রণজয়ের মাথা ঘুরে গেল। সে সেখানেই ধপাস করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

রণজয়ের আবার যখন জ্ঞান হল, সে দেখল একটা ঘরে সে একলা শুয়ে আছে। এটা তার আগেকার ঘর নয়। কারণ এ ঘরের দেয়ালে চার-পাঁচটা আলোর বাল্ব, আর সেগুলি থেকে আলো এসে পড়ছে তার চোখে। এরকম আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে কেন কে জানে!

সে তাড়াতাড়ি নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখল, না, এখনও সব চুল উঠে যায়নি। আর চোখের জল? সে নানারকম দুঃখের কথা ভাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার কান্না পেল না! তার চোখের জল বেরিয়ে একদম ফুরিয়ে গেছে।

ঘরের দরজা খোলা। এরা কোনও পাহারা রাখে না। এরা বোধহয় পাহারা দেবার কথাই জানে না। রণজয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সব রাস্তায় আলো জ্বলছে, কিন্তু লোক নেই। এটা বোধহয় ওদের ঘুমের সময়। রণজয়ের মনে হল, ওপরের তলার



শহরটার চেয়ে এই নীচের তলার শহরে মানুষ বা বাড়ি ঘর অনেক কম। বোধহয় ওদের অফিস টফিস সব এই তলায়। রণজয় তো ইচ্ছে করলেও ওপরের তলায় উঠতে পারবে না। কারণ সিঁড়িটা কোথায় থাকে সে জানে না।

সে একা একা ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। তার কিছুই ভালো লাগল না। তার ইচ্ছে করছে মরে যেতে। কিন্তু কী করে মরবে?

খানিকক্ষণ ঘোরার পর সে দেখল, একটা মাঠের মধ্য দিয়ে দু'জন লোক যাচ্ছে। রণজয় চুপিচুপি চলতে লাগল তাদের পেছন পেছন। একসময় তারা একটা গোল গম্বুজের সামনে দাঁড়াল। গোল গম্বুজ দেখেই রণজয় বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই ওখানে একটা সিঁড়ির দরজা আছে। আবার নীচের দিকে সিঁড়ি? তা হলে কি আরও একতলা শহর আছে নাকি? মাটির তলায় এরা কত তলা শহর বানিয়েছে?

লোক দুটো সত্যি একটা সিঁড়ির দরজা খুলে ফেলল। কিন্তু তারা সিঁড়ির দরজার পা দেবার আগেই পেছন দিক থেকে রণজয় বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। তারপর অসম্ভব জোরে মাথা ঠুকে দিল দু'জনের। লোক দুটো কোনও শব্দ করারও সময় পেল না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। রণজয় তাদের টেনে এনে গম্বুজের আড়ালে লুকিয়ে রেখে তারপর একা সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। নামছে তো নামছেই। কত যে সিঁড়ি তার আর ঠিক নেই। অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল বলমলে আলো।

নীচে নেমে রণজয় বুঝল, এই তলাটায় আছে ওদের সব কলকারখানা, কোনও জায়গায় তৈরি হচ্ছে আলো, কোনও জায়গায় খাবার, কোনও জায়গায় পোশাক। ঘুরে ঘুরে দেখছে রণজয়। বেশির ভাগ জায়গাতেই কাজ করছে যন্ত্র-মানুষ। কেউ কোনও কথা বলছে না, কাজে ফাঁকি দিচ্ছে না, এক মনে কাজ করে যাচ্ছে। সেই যন্ত্র-মানুষরা তার দিকে চেয়েও দেখছে না।

রণজয় ঘুরে ঘুরে দেখছিল, হঠাৎ এক জায়গায় মাইক্রোফোনে প্রচণ্ড শব্দে যেন কার কথা শোনা গেল। রণজয় তার এক অক্ষরও বুঝল না। আবার একটু দূরে আর এক

জায়গায় মাইক্রোফোনে সেইরকম কথা হল। কেউ যেন কারুক লুকুম দিচ্ছে। তারপর নানান দিক থেকে সেইরকম একই আওয়াজ।

রণজয়ের মনে হল, তাকেই ধরবার জন্য কেউ আদেশ দিচ্ছে না তো? নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে যে সে পালিয়েছে। কিন্তু রণজয় আর কিছুতেই ধরা দেবে না। দরকার হলে সে এখানেই মারামারি করে মরবে! কিন্তু এদের কাছে বন্দি হয়ে সে আর বেঁচে থাকতে চায় না।

একটা বাড়ি থেকে চারজন নীল মানুষ বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের হাতে টর্চ। রণজয় লুকিয়ে পড়ল একটা বাড়ির আড়ালে। সে জানে, ওই টর্চগুলো সাংঘাতিক। ওর থেকে এক ঝলক নীল আগুন বেরিয়ে চোখের নিমেষে তাকে পুড়িয়ে মারবে।

নানান বাড়ির আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে রণজয় এসে উপস্থিত হল একটা সুড়ঙ্গের মতন জায়গায়। সেখানে রয়েছে কয়েকটা গোল রকেট। রণজয়ের বুক কঁপে উঠল, এখানে ওদের রকেট তৈরি হয়। তারপর সেই রকেটগুলোকে আকাশে উড়িয়ে রাখে। রণজয় যদি একটা রকেট চুরি করতে পারে? কিন্তু সে তো জানে না, কীভাবে ওই রকেটগুলো চালাতে হয়! সে তো জানে না, কোন দিকে কত দূরে পৃথিবী।

তবু, একটা রকেটের দরজা খোলা দেখে রণজয় দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে সেটার মধ্যে উঠে পড়ল। তারপর টেনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। এটার মধ্যে বসে থাকলে ওরা অনেকক্ষণ তাকে খুঁজে পাবে না।

কিন্তু দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল, আর তার পরেই চলতে শুরু করল রকেটটা। সেই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে উল্কার মতন ছুটে সেটা বেরিয়ে গেল। প্রথম ঝাঁকুনিতে রণজয় ছিটকে পড়ে গেল, সে ভাবল নিশ্চয়ই রকেটটা কোনও দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে সে নিজেও মরবে!

কিন্তু রকেটটা চলতেই থাকল। রণজয় দেখল, রকেটটা সুড়ঙ্গ ছাড়িয়ে বাইরের আকাশে

এসে পড়েছে। রণজয় আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মুক্তি, মুক্তি। এবার সে পৃথিবীতে ফিরে যাবে।

রকেটটা চালাচ্ছে কে? যে চালাচ্ছে সে তো একটু বাদেই আবার এটাকে এই নীল মানুষের গ্রহে ফিরিয়ে আনতে পারে। রণজয় পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, একজন মাত্র লোক রকেটের ইঞ্জিনের সামনে বসে আছে। সে একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি, চালিয়ে যাচ্ছে এক মনে। এই লোকটা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

রণজয় জানে, এখানকার যে-কোনও মানুষের চেয়ে তার গায়ের জোর বেশি। সে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাকে কাবু করে দিতে পারে। কিন্তু তারপর সে রকেটটা চালাবে কী করে?

সে চুপিচুপি লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বলল, শিগগির আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে চলো। নইলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলব!

রণজয়ের চিৎকার শুনে লোকটি পেছন ফিরে তাকাল। তাকে দেখে ধড়াস করে উঠল রণজয়ের বুকটা। এ তো কোনও মানুষ নয়, রকেটটা চালাচ্ছে একটি পুতুল মেয়ে! রণজয়ের দিকে তাকিয়ে সে মিষ্টি করে হাসল আর তার গা থেকে টুং টাং শব্দ হতে লাগল।

রণজয় হায় হায় করে উঠল। এখন কী হবে? এই পুতুল তো তার কোনও কথাই বুঝবে না। আর তার বাঁচার কোনও আশাই রইল না। নিশ্চয়ই পেছন থেকে অন্য নীল মানুষরা আরও রকেট নিয়ে তাকে তাড়া করে আসবে।

রণজয় মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে ব্যাকুলভাবে বলল, হে ভগবান, আমাকে বাঁচাও! ভগবান, তুমি তো আকাশেই কোথাও থাকো, আমার ওপর দয়া করো!

তারপর সে মেয়ে পুতুলটাকে বলল, আমাকে একটু রকেট চালানো শিখিয়ে দাও না পুতুল, তোমার পায়ে পড়ি!

পুতুল শুধু মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল আর টুং টাং শব্দ করতে লাগল।

রকেটটা উল্কার মতন ছুটে চলেছে। রণজয় মাঝে মাঝে পেছনে তাকিয়ে দেখছে, অন্য কোনও রকেট তাকে তাড়া করে আসছে কিনা। এর দেয়ালটা স্বচ্ছ।

হঠাৎ পুতুলটা সামনে ঝুঁকে পট পট করে কয়েকটা সুইচ টিপে দিল। অমনি রকেটটা বাঁ দিকে বাঁকতে শুরু করল। রণজয়ের বুক কেঁপে উঠল আবার। পুতুলটা এবার বুঝি রকেটটা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে রণজয় সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোমেলো ভাবে সব ক'টা সুইচ টিপে দিল একসঙ্গে।

রকেটটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সম্পূর্ণ উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে চলল আবার। কতক্ষণ এইভাবে ছুটবে কে জানে!

রণজয় সামনের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে বসে রইল। ওরকমভাবে বসে থাকতে থাকতে তার ঘুম পেয়ে গেল একসময়।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সে জানে না। জেগে উঠে সে সামনে একটা দৃশ্য দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সামনে একটা সবুজ রঙের গ্রহ। ক্রমশই সেটা বড় হচ্ছে। সবুজ? পৃথিবীর গাছপালার রং সবুজ। তা হলে নিশ্চয়ই ওটা পৃথিবী। রণজয় চিৎকার করে উঠল, হু-র-রে! পুতুলটির কাঁধ চাপড়ে বলল, ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ! চাপড় খেয়ে পুতুলটি খুব জোরে জোরে টুং টাং টুং টাং করে উঠল।

কিন্তু রকেটটা এত জোরে গেলে তো সোজা পৃথিবীতে ধাক্কা খেয়ে একেবারে ছাতু হয়ে যাবে! এখন কী করে? এখান থেকে লাফিয়ে পড়লেও বাঁচার কোনও আশা নেই। রণজয় তো আর উড়তে জানে না। পৃথিবী ক্রমশই বড় হয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে সবুজ গাছপালা। একটা ঘন জঙ্গল।

রকেটটা যখন খুব কাছে এসে গেছে, তখন রণজয় আবার এলোপাথাড়ি কয়েকটা সুইচ টিপে দিল। তাতে হল ফল উলটো। রকেটের গতি একটু কমে গিয়ে আবার উলটো দিকে মুখ করল। তখন রণজয় আর কিছু চিন্তা না করে লাফিয়ে পড়ল দরজা খুলে।

হয়তো সে আছড়ে পড়ে মরে যাবে। কিন্তু পৃথিবীর বুকের ওপর গিয়ে মরবে, এইটুকুই তার আনন্দ। তার একমাত্র আশা, যদি কোনও সমুদ্রে বা হ্রদে গিয়ে পড়ে। তা হলে বেঁচেও যেতে পারে।

রণজয় সমুদ্রে বা হ্রদে পড়ল না, কিন্তু মরলও না। সে পড়ল কতকগুলো গাছপালার ওপর ঝপ করে। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল, গাছের ডালগুলো খুব নরম, অনেকটা রবারের মতন। বিরাট বিরাট গাছ। অনেক নীচে শুকনো পাতার স্তূপের ওপর গিয়ে পড়ল রণজয়। তার আগেই সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারল না যে সে বেঁচে আছে। নিজের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখল, কোথাও একটুও কেটে যায়নি পর্যন্ত। গাছের ডাল এত নরম হয়!

উঠে দাঁড়িয়ে সে ভাবল, এটা কোন জায়গা?

একটু বাদেই রণজয় বুঝল, সে পৃথিবীতে আসেনি। সে এসেছে অন্য কোনও গ্রহে। এখানকার গাছপালার রং পৃথিবীর মতন সবুজ হলেও একটা গাছও পৃথিবীর মতন নয়। সে একটা গাছের একটা ছোট ডাল ভেঙে নিতেই সেখানে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ডাল গজিয়ে উঠল। ঠিক যেন ম্যাজিক। আর একটা অদ্ভুত জিনিস, এখানকার মাটি সব সময় নড়ছে। সে কয়েক পা হাঁটতে গিয়েই বুঝতে পারল, সে আসলে হাঁটছে না, মাটিই সরে সরে যাচ্ছে। গাছপালাসুদ্ধ। যতদূর দেখা যায়, শুধু এইরকম গাছ। এর ফাঁকে ফাঁকে উড়ছে অনেক প্রজাপতি। সেগুলো নানান রঙের। কয়েকটা প্রজাপতি উড়তে উড়তে এসে রণজয়ের গায়ে ধাক্কা খেল। অমনি সেগুলো মিহি কাচের মতন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। এ আবার কী অদ্ভুত জিনিস।

সেই চলন্ত মাটির ওপর বসে পড়ল রণজয়। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, এটা পৃথিবী নয়। এ আবার কোন অদ্ভুত জায়গায় সে এসে পড়ল? এখান থেকে সে আর কোনওদিন ফিরতে পারবে!

দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে রণজয় কাতর স্বরে বলল, মা! মা, তোমায় আমি আর কোনওদিন দেখতে পাব না?

রণজয়ের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। তাতে আরও চমকে উঠল সে।

এই নতুন বিপদের মধ্যেও সে খুশি হয়ে উঠল এইজন্য যে, এখনও সে কাঁদতে পারে। এখনও সে মানুষ আছে!

ভূতের দেশে নীল মানুষ

সেই রণজয়ের কথা মনে আছে? অন্য গ্রহের মানুষের ছোঁয়ায় যার গায়ের রং একেবারে নীল হয়ে যায় আর সে লম্বাও হয়ে যায় অনেকখানি। তখন তার বাবা-মা আর বন্ধুরা কেউ তাকে দেখে চিনতে পারত না, সবাই তাকে মনে করত একটা নীল রঙের দৈত্য। তারপর রণজয় বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত, তবু একদিন অন্য গ্রহের নীল মানুষরা জোর করে ধরে নিয়ে গেল তাকে। সেখানে সেই গ্রহে কোনও গাছপালা নেই, জল নেই, কোনও মানুষের মাথায় চুল নেই, ভুরুও নেই। তারা থাকে মাটির নীচে শহর বানিয়ে। সেইসব মানুষেরা খরগোশ কিংবা গিনিপিগের মতন রণজয়ের শরীরটা কেটেকুটে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রণজয়ের গায়ের জোর ওদের চেয়ে অনেক বেশি। সে কোনওরকমে সেই লোকগুলোর হাত ছাড়িয়ে একটা রকেট চুরি করে পালিয়েছিল।

সেই রকেটটা চালাচ্ছিল একটা মেয়ে। সে কিন্তু সত্যিকারের মেয়ে নয়। মেয়ের মতন চেহারার একটা যন্ত্র-পুতুল, অর্থাৎ রোবোট। সেই মেয়ে পুতুলটি কোনও কথা বোঝে না, শুধু হাসে আর তার গা দিয়ে টুং-টাং শব্দ বেরোয়। রণজয় তো রকেট চালাতে জানে না, সে মেয়ে পুতুলটিকে অনেক কাকুতি-মিনতি করল তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু পুতুলটা কিছুই বোঝে না। তখন রণজয় রাগের চোটে রকেটের সব ক'টা সুইচ টিপে দিল এলোমেলো ভাবে। মহাশূন্যে রকেটটা ছুটেতে লাগল উল্কার বেগে। তারপর রকেটটা যখন একটা সবুজ রঙের গ্রহের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে, তখন রণজয় মনে করল,

ওই তো পৃথিবী। সে আর প্রাণের মায়া না করে লাফ দিল সেই রকেট থেকে।

তবু রণজয় মরল না। সে এসে পড়ল কতকগুলো নরম গাছপালার ওপরে। তার হাত পা-ও ভাঙেনি। সবুজ রঙের গাছ দেখে রণজয় ভাবল, সে সত্যিই আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। সেইজন্য সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু রণজয় আসলে পৃথিবীতে ফেরেনি। সে এসেছে অন্য একটা অজানা গ্রহে। এবার শোনাচ্ছি তার পরের কাহিনি।

অনেক ডালপালা ছড়ানো একটা মস্ত বড় গাছের নীচে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল রণজয়। আবার কোন নতুন বিপদের মধ্যে পড়ল, তা বোঝবার চেষ্টা করল। এটা আবার কোন অদ্ভুত জায়গা? তবে একটা খুব বড় কথা, এখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিতে তার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

কিছু প্রজাপতি ছাড়া আর কোনও জীবন্ত প্রাণী এ পর্যন্ত তার চোখে পড়েনি। প্রজাপতিগুলোও অদ্ভুত। দু’-একটা উড়তে উড়তে এসে তার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে একেবারে। যেন খুব পাতলা কাচের তৈরি। কিন্তু কাচের প্রজাপতি কি ইচ্ছে মতন ওড়াউড়ি করতে পারে? সে নিজে থেকেই একটাকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু হোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল, ধুলো হয়ে গেল একেবারে। আশ্চর্য! অথচ প্রজাপতিগুলোকে দেখতে ভারী সুন্দর।

যতদূর দেখা যায়, শুধু জঙ্গল। সব গাছই বেশ বড় বড়। তবে কোনও গাছেই ফুল বা কোনওরকম ফল দেখতে পেল না রণজয়। তার খুব খিদেও পেয়েছে, জল তেষ্ঠাও পেয়েছে। এখানে কি মানুষের খাদ্য কিছু পাওয়া যাবে? তবে গাছ যখন আছে তখন জল আছে নিশ্চয়ই!

রণজয় উঠে পড়ে হাঁটতে লাগল। আরও একটা ব্যাপার দেখে তার প্রথমেই খটকা লেগেছিল। যে-কোনও জঙ্গলেই মাটিতে অনেক শুকনো পাতা পড়ে থাকে। এই জঙ্গলের মাটি একেবারে পরিষ্কার। এত গাছ অথচ একটাও পাতা পড়ে না মাটিতে; এখানকার মাটিও খুব সূক্ষ্ম বালির মতন।

হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলটা পার হয়ে রণজয় একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছোল। তারপরই দেখতে পেল একটা নদী।

নদীটা বেশ চওড়া, তার ওপারে আর একটা জঙ্গল। ওদিকের জঙ্গলটা অন্য রকম। এদিকের জঙ্গলে যেমন নানা রকমের গাছ, কিন্তু নদীর ওপারের জঙ্গলে সব গাছ এক রকম। প্রত্যেকটি গাছই বেশ মোটা আর লম্বা, আর তাদের প্রত্যেকের ঠিক দুটি করে ডাল। ঠিক যেন দুটো হাতওয়ালা গাছ।

রণজয় নদীর জলের কাছে নেমে এল। জল বেশ পরিষ্কার। ছোট ছোট রঙিন মাছও দেখতে পেল কিছু। রণজয় হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে চিন্তা করতে লাগল একটু। সে খুবই ভালো সাঁতার জানে, এই নদীর জল যতই গভীর হোক সে পার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এই নদীতে কুমিরের মতন কোনও হিংস্র জানোয়ার আছে কিনা তা কী করে জানা যাবে? তারপর সে ভাবল, দেখাই যাক না, কী হয়?

রণজয় নদীটা সাঁতারে চলে এল এপারে। কিছুই হল না। কিন্তু এদিকে এসে তার খুব লাভ হল প্রথমে। সে দেখল নদীর পারের বালিতে কয়েকটা গর্ত, একটা গর্তের মুখের কাছে একটা গোল ডিম। রণজয় দেখেই চিনতে পারল, ওগুলো কচ্ছপের ডিম। সে গ্রামের ছেলে, সে এসব চেনে। তা হলে এই নদীতে কচ্ছপ আছে। গর্তগুলোর মধ্যে হাত দিয়ে রণজয় দশ-বারোটা ডিম পেয়ে গেল, তারপর সেগুলো ভেঙে কাঁচাই খেয়ে ফেলল। তাতে খিদে মিটল খানিকটা। এরপর নদীর জল পান করে তার প্রাণ ঠান্ডা হল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে শুনতে পেল একটা গর্জন। চমকে তাকিয়ে দেখল একটা হলুদ রঙের প্রাণী ছুটে বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে। এক পলক তাকিয়েই রণজয় বুঝল সেটা বাঘের মতনই একটা প্রাণী, বাঘের চেয়ে অনেক বড়। আর মুখের সামনে দিয়ে বুনো শূয়োরের মতন দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে। রণজয় আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। বাঘের সঙ্গে দৌড়ে পারা যাবে না। জলে ডুব সাঁতার দিয়ে যদি বাঁচা যায়।

বাঘের মতন প্রাণীটা কিন্তু রণজয়কে গ্রাহ্যও করল না। সে নিজেই খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। কেউ যেন তাকে তাড়া করে আসছে। দাঁতালো বাঘটাও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, খুব তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠল।

রণজয় বুকজলে দাঁড়িয়ে দেখল, ওপারে গিয়ে দাঁতালো বাঘটা আর দৌড়োতে পারল না, বালির ওপর ধপ করে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। ও যেন খুবই আহত, এফুনি মরে যাবে।

বিস্ময়ে রণজয়ের চোখ যেন একেবারে কপালে উঠে গেল। এরকম হিংস্র বাঘও ভয় পায় কাকে? কে ওকে আঘাত করেছে? ওর চেয়েও কোনও বড় আরও ভয়াবহ প্রাণী আছে এখানে? কিন্তু কিছু তো ওকে তাড়া করে এল না! জঙ্গলের মধ্যে কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

রণজয়ের কাছে নদীটাই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হল। সে সাঁতরাতে শুরু করল নদীর মাঝখান দিয়ে। বাঘটাকে মরতে দেখে তার গা ছমছম করছে।

রণজয় সাঁতার কাটতে ভালোবাসে। সে তরতর করে অনেক দূরে চলে যেতে লাগল। প্রায় এক ঘণ্টা সাঁতরে সে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে আবার পারে উঠে এল বিশ্রাম করবার জন্য।

বালির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তেই সে আকাশে খুব জোরে গোঁ-গোঁ শব্দ শুনতে পেল। তারপরই দেখল, একটা গোল মতন রকেট তীব্র জোরে উড়ে যাচ্ছে। এই রকেটটা চড়েই তো রণজয় এসেছিল! রকেটটা এই গ্রহটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। রণজয় হাত তুলে চৈচিয়ে ডাকল, এই, এই! কিন্তু ততক্ষণে রকেটটা আবার মিলিয়ে গেছে। তা ছাড়া তার ডাক তো কেউ শুনতে পাবে না, রকেটটা চালাচ্ছে তো একটা মেয়ে পুতুল!

রণজয় তাকিয়ে দেখল, নদীর এপারেও সেই দুটি ডালওয়ালা গাছের জঙ্গল। এই গাছগুলোকে দেখলেই যেন কেমন লাগে। সব গাছের ঠিক দুটো করে ডাল কেন?

রণজয়ের ভীষণ একা লাগল। মানুষের মতন কোনও প্রাণী এই গ্রহে সে এ পর্যন্ত

দেখেনি। তা হলে সেরকম কিছু নেই বোধহয়। শুধু জঙ্গল আর কিছু জঙ্গ-জানোয়ার! এইখানে তাকে সারা জীবন থাকতে হবে? এখান থেকে চলে যাবার তো কোনও উপায় নেই। দূর থেকে সবুজ গাছপালা দেখে সে এই গ্রহটাকে পৃথিবী বলে ভুল করেছিল। তার ধারণা ছিল, মহাবিশ্বের আর কোনও গ্রহে সবুজ গাছপালা নেই।

খুব চড়া রোদে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? গাছের ছায়ায় গিয়ে বসবার জন্য সে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপরই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হল।

রণজয় কিছু বোঝবার আগেই সে দেখল যে সে মাটি থেকে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। একটা গাছের ডাল তাকে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল অনেক দূরে, সে গিয়ে পড়ল আর একটা গাছের ওপর। সেই গাছটাও ছুড়ে দিল তাকে। এবারও সে মাটিতে পড়ল না, অন্য একটা গাছ ঠিক যেন হাত বাড়িয়ে ধরে নিল। গাছগুলো লোফালুফি খেলতে লাগল তাকে নিয়ে।

এই গাছগুলো শুধু যে জীবন্ত তাই নয়, এরা হচ্ছে মতন ডালপালা নাড়তে পারে। রণজয় একেবারে অসহায়, সে কোনও গাছের ডাল আঁকড়ে ধরবার আগেই গাছেরা তাকে ছুড়ে দিচ্ছে ওপরে। আর কিছুক্ষণ এমনভাবে চললে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তার প্রাণটাও থাকবে না।

একবার একটা গাছের ডাল ফসকে গেল, তাকে ঠিক ধরতে পারল না। রণজয় পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে খুব জোরে গড়াতে লাগল। অন্য গাছের ডালগুলো নিচু হয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করল খুব, কিন্তু তার আগেই রণজয় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল জঙ্গলের বাইরে। আবার নদীর ধারে এসে সে হাঁপাতে লাগল। দারুণ ভয়ের সঙ্গে সে চেয়ে রইল জঙ্গলটার দিকে। বাবা রে, কী সাংঘাতিক গাছ! তবু ভাগ্য ভালো যে গাছগুলো চলাফেরা করতে পারে না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর রণজয় আবার উঠে নদীটার ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। কোনওরকম বিপদ দেখলেই সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এর মধ্যে আবার তার খিদেও

পেয়ে গেছে, কিন্তু আর কচ্ছপের ডিম তার চোখে পড়ছে না।

জঙ্গলটা এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল, তারপর ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রণজয়ের। মাঠের মধ্যে পর পর কয়েকটা বাড়ি। নীল মানুষদের গ্রহে যেমন দেখেছিল, এখানকার বাড়িও সেইরকম গোল গোল ধরনের।

বাড়ি যখন আছে, তখন মানুষের মতন প্রাণীও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারা কীরকম মানুষ হবে? যদি হিংস্র হয়? রণজয় একা, তার কাছে কোনও অস্ত্রও নেই। তবু রণজয় এক পা এক পা করে এগোল।

একটা বাড়ির খুব কাছে গিয়ে দেখল, বাড়িটা শুধু পাথরের তৈরি। সামনে খানিকটা জায়গা বাগানের মতন, কিন্তু সেখানে একটাও গাছ নেই, এমনকী ঘাসও নেই। একটু দূরে একটা পুকুর, তার ঘাট চমৎকার পাথর দিয়ে বাঁধানো। প্রথমেই বাড়ির মধ্যে না ঢুকে সে সেই ঘাটে গিয়ে বসল।

একটু পরে তার মনে হল, ঘাটের কাছে পুকুরের জল নড়ছে। তারপর জলে ঝাপস-ঝুপস শব্দ হতে লাগল, ঠিক যেন মনে হল কয়েকজন একসঙ্গে স্নান করতে নেমেছে। কিন্তু কারওকেই দেখা যাচ্ছে না।

রণজয়ের সমস্ত শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল ভয়ে। সে উঠে দাঁড়াতেই শুনতে পেল মেয়েলি গলার আওয়াজ। ওই জলের কাছেই। তবু কারুকে দেখা যাচ্ছে না, কথাগুলোর মানেও বোঝা যাচ্ছে না।

রণজয় এক পা এক পা করে পিছিয়ে যেতে লাগল। ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এখন দুপুরবেলা, সে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে অথচ তাদের দেখতে পাচ্ছে না, এর মানে কী?

তারপরই তার ঠিক কানের কাছে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কিম্ কিল্লা সুলি?

রণজয় সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে দেখল, কেউ নেই!



সে জিজ্ঞেস করল, কে? কে কথা বলছে?

আবার সেই অদ্ভুত প্রশ্ন: কিম্ কিলা সুলি?

প্রাণের ভয়ে এক দৌড় মারল রণজয়। আর কিছু না ভেবে পেয়ে ঢুকে পড়ল পাথরের বাড়িটার মধ্যে।

বাড়িটার একতলায় একটা মস্ত হলঘরের মতন, এক পাশ দিয়ে ওপরে ঝুঁকানো সিঁড়ি। দোতলায় চারটে গোল ঘর। আলমারি, চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা সবই আছে ঘরগুলোতে, কিন্তু মানুষজন কেউ নেই। দেখলে মনে হয়, অনেকদিন এসব ঘরে কোনও মানুষ থাকেনি!

বাড়িটাতে খাবারের জিনিস কিছুই নেই।

একটু পরে রণজয় আবার বাইরে বেরিয়ে এল। বিকেল হয়ে এসেছে। রোদের তেজ অনেক কম। কিছু দূরে আর একটা বাড়ি দেখে রণজয় ছুটে গেল সেদিকে, যদি সেখানে কিছু খাবার পাওয়া যায়।

সে বাড়িটারও দরজা খোলা। ভেতরটা একই রকম। অনেক জিনিসপত্র আছে, কিন্তু কোনও জীবিত প্রাণী নেই।

পরপর কয়েকটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখে এল রণজয়। সব ঠিক একই রকম অবস্থা। রূপকথায় যেমন মৃত্যুপুরীর কথা পড়েছে রণজয়। এ যেন ঠিক তাই। এখানে একসময় মানুষের মতন প্রাণী ছিল, এখন নেই।

ক্লান্ত হয়ে রণজয় একটা বাড়ির দরজার সামনে যেই বসেছে, অমনি কানের কাছে কে আবার বলে উঠল, কিম্ কিলা সুলি?

রণজয় ভয় পেল, কিন্তু তার আর পালাবার শক্তি নেই!

এবার একসঙ্গে তিন-চারটে গলায় নানারকম কথা শোনা গেল। কিন্তু কোনওটারই মানে বুঝতে পারল না সে।

রণজয় তখন কাঁদোকাঁদো হয়ে হাত জোড় করে বলল, আপনারা কে? কেন আমাকে

ভয় দেখাচ্ছেন? আমি আপনাদের দেখতেও পাচ্ছি না, কথাও বুঝতে পারছি না।

এবার একটা গলার আওয়াজ শোনা গেল, খুন বুলি কুলু?

রণজয় বলল, এটা কী ভাষা? আপনারা দেখা দিচ্ছেন না কেন?

ঠিক যেন কেউ ঠাস করে একটা চড় কষাল রণজয়ের গালে।

রাগে মরিয়া হয়ে রণজয় সামনের দিকে ঘুষি চালাল, কিন্তু কোনও কিছুই তার হাতে লাগল না।

অদৃশ্য হাতের আরও দু’-একটা চড় খেয়ে রণজয় বুঝল, ভূতের সঙ্গে মারামারি করে সে কিছুতেই পারবে না। প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে দৌড়াল অন্ধের মতন।

কিন্তু রণজয় বেশি দূর যেতে পারল না। হঠাৎ যেন একটা ঝড় উঠল। সেই ঝড়ের ধাক্কায় রণজয় পড়ে গেল মাটিতে। আকাশে মেঘ নেই। তবু এ কেমন অদ্ভুত ঝড়!

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও রণজয় ঠিক মতন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, ঝড়ের হাওয়া তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে একদিকে। মাঝে মাঝে আছাড় খেতে খেতে ঝড়ের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত সে ধাক্কা খেয়ে থামল একটা বড় বাড়ির দরজার কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেঁটে মতন মানুষ।

তাকে দেখেই রণজয় আবার আঁতকে উঠল। তার মানুষের মতনই চোখ, মুখ, নাক আছে বটে, কিন্তু সারা শরীরে জেব্রার মতন ডোরাকাটা। বেশ বড় বড় লোমও আছে গা-হাত-পা জুড়ে। শুধু একটা চামড়ার হাফপ্যান্ট পরা, আর কোনও পোশাক নেই।

লোকটি মোটা গলায় জিঙ্গেস করল, কিলি উলা নাসু নাসু?

কোনও উত্তর না দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল রণজয়। সে প্রথমেই দেখে নিয়েছে, ওই জেব্রার মতন ডোরাকাটা মানুষটার হাতে কোনও অস্ত্র নেই, তাকে চট করে মেরে ফেলতে পারবে না।

লোকটা সামনের দিকে চেয়ে কাকে যেন জিঙ্গেস করল, মিসি নিসি কিলি?

হাওয়া থেকে অদৃশ্য গলা উত্তর দিল, খুলু খুলু বুলু খুলু—।

রণজয় শুয়ে পড়ল মাটিতে। আর সে সহ্য করতে পারছে না। তার বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হচ্ছে।

ডোরাকাটা চেহারার লোকটা রণজয়ের পাশে বসে আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল।

রণজয় চৈঁচিয়ে বলল, আমি তোমাদের ভাষা জানি না! আমি কিছু বুঝতে পারছি না! এটা কি ভূতের দেশ? সবাই অদৃশ্য, তুমি কি জ্যাস্ত ভূত?

লোকটা রণজয়ের একটা হাত ধরল খুব আলতোভাবে। রণজয় বাধা দিল না। এখনও তার গায়ে যা জোর আছে, তাতে এই লোকটাকে সে তুলে আছাড় দিতে পারে। তার আগে দেখাই যাক না ও কী করতে চায়?

ডাক্তাররা যেমন নাড়ি দেখে, সেইভাবে লোকটা রণজয়ের বাঁ হাত ধরে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, ডিম্‌সি জুমিলি জুমিলি। তুমি কে?

লোকটির মুখে এতক্ষণে বাংলা শুনে রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল আবার। সে কানে ঠিক শুনেছে তো? লোকটা বাংলায় কথা বলছে সত্যি?

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

রণজয় বলল, আমি একজন মানুষ!

লোকটি বলল, মানুষ কাকে বলে?

রণজয় বলল, পৃথিবী গ্রহের অধিবাসীদের নাম মানুষ।

লোকটি বলল, পৃথিবী গ্রহ কোথায়?

রণজয় বলল, পৃথিবী গ্রহ কোথায়, সেটা কী করে বোঝাব? এটা কোন জায়গা, তাও আমি জানি না। তুমি... তুমি কি সূর্যের নাম শুনেছ? সূর্যের এক সন্তানের নাম পৃথিবী।

লোকটি বলল, সূর্য কাকে বলে আমি জানি না।

রণজয় বলল, তুমি সূর্য জানো না, পৃথিবী জানো না, তবে আমার ভাষায় কথা বলছ কী করে?

লোকটি বলল, তোমার গা ছুঁয়ে আমি তোমার ভাষায় কথা বলছি। পৃথিবীর প্রাণী বুঝি তোমার মতন এত লম্বা হয়? আর এরকম নীল রঙের গা হয়?

রণজয় বলল, না। আমার এই চেহারা অন্য গ্রহের প্রাণীর করে দিয়েছে। তারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি পালিয়ে এসেছি।

লোকটি বলল, তুমি ভুল জায়গায় এসেছ। এখানে তুমি বাঁচতে পারবে না।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, আমায় তোমরা মেরে ফেলবে? কিন্তু আমি তো তোমাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা করিনি। অদৃশ্য থেকে যারা কথা বলছে, তারা কারা?

লোকটি বলল, তুমি উঠে এসো আমার সঙ্গে। তোমায় একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

রণজয় বলল, আমি ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। আগে আমায় কিছু খাবার দিতে পারো?

লোকটি বলল, সেই তো মুশকিল। আমাদের এখানে কোনও খাবার নেই।

রণজয় বলল, কোনও খাবার নেই? তা হলে তুমি বেঁচে আছ কী করে?

লোকটি বলল, সেই জিনিসটাই তো তোমাকে দেখাতে চাইছিলাম। শোনো, এই যে আমাকে দেখছ, এরকম চেহারার শুধু আমিই একা এই গ্রহে আছি। তাও আর বেশিক্ষণ নেই। খাবারের অভাবে আমাদের সবার শরীর বাদ চলে যাচ্ছে। এই গ্রহের গাছেদের সঙ্গে আমাদের লড়াই চলছে।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, গাছেদের সঙ্গে লড়াই? সে আবার কী?

লোকটি বলল, হ্যাঁ। কিছুদিন আগে একটা জ্বলন্ত উষ্ণা এসে পড়েছিল এই গ্রহে। তার প্রভাবে এখানকার গাছগুলো হঠাৎ খুব হিংস্র হয়ে গেছে। তারা ইচ্ছে মতন ডালপালা নাড়াতে পারে। কোনও গাছ এখন আর মরে না। একটা ডাল ভেঙে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর-একটা ডাল গজিয়ে যায়। আমরা এতকাল ধরে গাছ কেটেছি বলে এখন গাছগুলো আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। আমাদের কাছাকাছি পেনেই গাছ আছড়ে আছড়ে আমাদের মেরে ফেলে। বাঘ, সিংহ, হরিণের মতন যত জন্তু বনে ছিল, গাছগুলো

তাদেরও মেরে ফেলছে। আমরা গাছগুলোর সঙ্গে অনেক লড়াই করেও পারিনি, আমরা হেরে গেছি। ওরা এই গ্রহ থেকে সমস্ত প্রাণীকে শেষ করে দিতে চায়।

রণজয় বলল, কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ফেলা যায় না?

লোকটি বলল, এই গ্রহে এখন আর তা যায় না। কেটে ফেললেই সেখানে নতুন গাছ গজায় বললাম যে! গাছ লতাপাতা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কিন্তু মানুষ ছাড়াও গাছ বাঁচতে পারে! খাদ্যের অভাবে আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি!

রণজয় বলল, কিন্তু নদীতে তো মাছ আর কচ্ছপ আছে দেখলাম। তোমরা ওগুলো খাও না?

লোকটি বলল, মাছ আর কচ্ছপ খেয়ে বেশিদিন বাঁচা যায় না। সেইজন্য আমরা একটা অন্য উপায় বার করেছি।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, এই যে অদৃশ্য থেকে কথা বলছে, ওরা কারা?

লোকটি বলল, ওদের আগে আমারই মতন চেহারা ছিল। খাদ্যের অভাবে এখন আমরা শরীরটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, শুধু প্রাণটা রাখছি। শরীর না থাকলে খাবারেরও প্রয়োজন হয় না। আর শুধু প্রাণটা অদৃশ্য হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ালে গাছও আর আমাদের ধরতে পারে না। এসো, দেখবে এসো—

লোকটি রণজয়ের হাত ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে মস্ত বড় একটা হলঘরের মধ্যে সারি সারি খাট পাতা। প্রত্যেকটি খাটে ওইরকম জেব্রার মতন ডোরাকাটা চেহারার একজন করে মানুষ শুয়ে আছে। একটু কাছে গিয়ে রণজয় দেখল, সেই মানুষগুলোর অনেকের চেহারা কাচের মতন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, কারও অর্ধেকটা কাচের মতন। সবাই ঘুমন্ত।

রণজয়ের সঙ্গে লোকটি বলল, এদের একরকম অ্যাসিড মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। শরীরটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। তারপর প্রাণটা বাতাসে ঘুরে বেড়াবে। এই আমাদের একমাত্র বেঁচে থাকার উপায়। আমিই শেষ, একটু পরে আমিও অ্যাসিড মেখে শুয়ে পড়ব!

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লোকটি বলল, নীল রঙের মানুষ, তুমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছ। এখানে তোমারও বাঁচার উপায় নেই। তুমি আমাদের মতন শরীরটাকে বাদ দিয়ে অদৃশ্য হতে চাও? তা হলে তোমাকেও অ্যাসিড মাখিয়ে শুইয়ে দিতে পারি।

রণজয় চিৎকার করে বলল, না!

লোকটি বলল, তা ছাড়া তোমার আর বাঁচবার কোনও রাস্তা নেই! একসময় আমাদের এখানেও কত সুখের সংসার ছিল, ছেলেমেয়েরা খেলা করত বনের মধ্যে, এখন সব শেষ! এসো, তুমিও আমাদের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে থাকবে!

রণজয় বলল, না! আমি শরীর বাদ দিয়ে বাঁচতে চাই না!

ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রণজয় বাইরে বেরিয়ে এল। যেমন করেই হোক, তাকে নদীর ধারে পৌঁছাতেই হবে। নদীর মাছ আর কচ্ছপের ডিম খেয়ে যে-কটা দিন বাঁচতে পারা যায় সেই চেষ্টাই করতে হবে। কখনও বাঁচার আশা ছাড়তে নেই।

নদীর ধারে পৌঁছোল বটে রণজয়, কিন্তু কচ্ছপের ডিমও খুঁজে পেল না আর খালি হাতে মাছও ধরা যায় না। খানিকটা জল খেয়ে রণজয় বালির ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবল, প্রথমে যে জঙ্গলটার ওপর এসে সে পড়েছিল, সেখানকার গাছগুলো কিন্তু তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেনি। কিছু কিছু গাছ কি এখনও ভালো আছে? সেই জায়গাটা খুঁজে পেলে বোধহয় আরও কিছুদিন বাঁচা যাবে।

আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে গেল। চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রণজয়। একসময় একটা প্রচণ্ড শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। তার মধ্যে আকাশ চিরে ছুটে যাচ্ছে একটা গোল আলোর বল। রণজয় বুঝতে পারল, এটা সেই রকেটটা, আর একবার ঘুরে এসেছে। রণজয় করুণ চোখে সেটার দিকে চেয়ে রইল। ইস। রকেটটা যদি একবার এখানে নামত—

সত্যিই কিন্তু রকেটটা আস্তে আস্তে নামতে লাগল। রণজয়ের প্রথমে মনে হল, সেটা

বুঝি নদীর বুকে পড়বে। কিন্তু তা হল না, রকেটটা এসে নামল জঙ্গলের ধারে। রণজয় সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সেই দিকে। ওই জঙ্গলের গাছগুলো যে ভয়াবহ, সে কথা ভুলে গেল রণজয়।

যে রকেটের দরজা খুলে সে লাফিয়েছিল, দরজাটা সেরকম খোলাই আছে। রণজয় হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে দেখল, সুইচবোর্ডের কাছে চুপ করে বসে আছে পুতুল মেয়েটি। রণজয় তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ওগো পুতুল মেয়ে, শিগগির এখান থেকে চলে চলো! এ গ্রহটা অতি ভয়ংকর।

পুতুল মেয়ে যে কথা বলে না, তা রণজয় জানে। কিন্তু আগে রণজয় দেখেছে যে পুতুল মেয়েদের কিছু জিজ্ঞেস করলেই তারা হাসে আর তাদের গা থেকে টুং-টাং শব্দ হয়। এবার সেরকম কিছুই হল না। রণজয় দু’-তিনবার কথা বলল, পুতুল মেয়েটিকে ধরে ঝাঁকুনি দিল। তবু সে কোনও সাড়াশব্দ করল না। তখন রণজয় বুঝতে পারল, পুতুলটার ভেতরের যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে, তাই রকেট চালাবার ক্ষমতা ওর আর নেই।

পরের মুহূর্তেই একটা ঝাঁকুনি লেগে রকেটটা শূন্যে উঠে গেল।

রণজয় প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। রকেটটা খানিকটা উঠে আবার নেমে এল নীচে। আবার কেউ সেটাকে ছুড়ে দিল ওপরে।

এইরকম কয়েকবার হতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। হিংস্র গাছগুলো রকেটটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে। ঠিক যেন একটা বল। যে-কোনও সময় ওরা এটাকে মাটিতে আছড়ে ফেলবে। ক্রমশই তারা এত জোরে জোরে ছুড়ছে যে রণজয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

রণজয় পাগলের মতন সুইচগুলো টিপতে লাগল। কোনটাতে কী কাজ হয় সে জানে না। কিন্তু রকেটটা চালাতে না পারলে তার বাঁচবার আর কোনও আশা নেই। সব ক’টা সুইচ টিপে দেবার পর রকেটটা থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ হতে লাগল। তারপরই গাছগুলো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ওপরে।

রণজয় বিরাট জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

একটু পরেই সে রকেটের জানলা দিয়ে দেখল, সেই ভয়ংকর গ্রহ থেকে অনেক ওপর উঠে এসেছে। গাছগুলোকে তখনও দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ওরা হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে রকেটটাকে।

তারপর আর কিছুই দেখা গেল না। আকাশের মহাশূন্যে রকেটটা ছুটে যেতে লাগল উল্কার চেয়েও বেশি জোরে।

সেই একলা নীল মানুষ

রণজয় মেয়ে-পুতুলটিকে দু’-একবার উলটে পালটে দেখল। তার ধারণা, স্ত্রিং-এর পুতুলের মতন এরও নিশ্চয়ই গায়ে কোথাও চাবিটাবি আছে। দম দিয়ে দিলেই আবার চলবে। কিন্তু এ তো সাধারণ পুতুল নয়, এ হচ্ছে রোবো। দারুণ সূক্ষ্ম এর যন্ত্রপাতি। ওকে ঠিক করার সাধ্য রণজয়ের নেই।

শুয়ে থাকা পুতুলটিকে অবিকল একটা মেয়েরই মতন দেখতে। ওর জন্য খুব দুঃখ হল রণজয়ের। পুতুলটি কথা বলতে পারত না বটে কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে তাকাত, হাসত। আর মাঝে মাঝে ওর গা থেকে টুং-টাং শব্দ হত, তবু মনে হত, একজন কেউ সঙ্গে আছে।

কিন্তু এখন রণজয় একদম একা।

রকেটটা কত মাইল গতিতে যাচ্ছে রণজয় জানে না। মহাকাশে মহাশূন্যে কোথাও কিছু দেখা দেয় না। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন রণজয়ের ভয় হয় যে হঠাৎ কোনও গ্রহতে ধাক্কা লাগলে একেবারে সবসুদু ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু রণজয়ের কিছু করবারও তো নেই। সে দু’-একবার রকেটটার নানান বোতাম টিপে দেখেছে, কিন্তু তাতে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে না। এই রকেটটা যেন সোজাই চলতে জানে শুধু।

অন্ধকার কেটে গিয়ে মাঝে মাঝে আলোর মধ্যও এসে পড়ে রকেটটা। আমরা যে আলো চিনি, শুধু সেই আলো নয়, কত রকমের অদ্ভুত আলো। কমলা-বেগুনি-নীল-সবুজ রঙের আলো।

মাঝে মাঝে খুব দূরে একটা কোনও জ্বলজ্বলে নক্ষত্র বা উল্কাও সে দেখতে পায়, কিন্তু সেদিকে সে তো ইচ্ছে করলেও যেতে পারবে না।

রকেটটাই বা এরকমভাবে কতদিন চলবে? একসময় নিশ্চয়ই জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে। তখন কী হবে? রণজয় আর ভাবতে পারে না।

রণজয়ের খিদে পেয়েছে। বেঁচে থাকতে হলে তো কিছু খেতে হবেই।

রণজয় চালকের আসন ছেড়ে উঠে সারা রকেটটা ঘুরে দেখতে গেল।

রকেটটা বেশ ছোট। ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতিই বেশি। তা ছাড়া আছে একটি মাত্র ঘর, আর একটা বাথরুম। খাবার জিনিস রাখবার কোনও ব্যবস্থা নেই।

তখন রণজয়ের মনে পড়ল এটা আকাশে-ওড়া পরীক্ষার রকেট। মানুষ নেবার কথা নয়। সারি সারি এরকম অনেক ছোট রকেট সাজানো ছিল নীল মানুষদের গ্রহে, প্রত্যেকটিতেই একটা করে পুতুল-মেয়ে। রণজয় সেই রকমই একটা রকেট চুরি করে পালিয়েছে।

আকাশে-ওড়া পরীক্ষার রকেট বলেই এতে কোনও খাবার রাখা নেই। রোবো পুতুলগুলোর আয়ুও কম। তা হলে জ্বালানিও তো বেশি থাকবার কথা নয়, তবু রকেটটা দিনের পর দিন চলছে কী করে?

কিন্তু মানুষ সব সময়ই বাঁচতে চায়। রণজয় ভাবল, না খেয়েও তো মানুষ অনেকদিন বাঁচতে পারে। শহিদ যতীন দাস জেলখানার মধ্যে বাষট্টি দিন না তেষট্টি দিন যেন অনশনে ছিলেন। তার মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটে যাবে। তবে রণজয় কি অতদিন পারবে? এর মধ্যেই তার পেটে খিদের আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে।

কিছুই করবার নেই বলে রণজয় নিরাশভাবে চোখ বুজে বসে রইল। একটু বাদেই ঘুম এসে গেল তার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে জানে না, হঠাৎ একটা কর্কশ শব্দে তার ঘুম ভাঙতেই সে চমকে লাফিয়ে উঠল।

কোথা থেকে এল আওয়াজ। এই মহাশূন্যে তো কোনওরকম শব্দ নেই। এমনকী রকেটের শব্দও ভেতরে বসে শোনা যায় না। চারদিকের স্বচ্ছ কাচের জানলায় রণজয় ঘুরে ঘুরে দেখে এল। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু অসীম শূন্য। তবে এ জায়গাটা অন্ধকার নয়, পাতলা নীল আলো ছড়িয়ে আছে।

তখন রণজয় ভাবল, তা হলে, নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখেছে। এই কথা ভাবতে না ভাবতেই আবার সে শুনতে পেল সেইরকম শব্দ। দূর্বোধ্য ভাষায় কে যেন তাকে ধমকে কিছু বলছে।

এবারে সে লক্ষ করল, ইঞ্জিনঘরের ওপর দিকে একটা জাল ঢাকা দেওয়া গোল গর্ত। আওয়াজটা আসছে সেখান থেকে। ওটা নিশ্চয়ই খবর পাঠাবার যন্ত্র। বহু দূর থেকে কেউ তাকে ডাকছে?

কিন্তু একটা অক্ষরও যে বোঝবার উপায় নেই। এমনকী মানুষের গলার আওয়াজ কিনা তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টিয়াপাখি মানুষের মতন কথা বলতে শিখলে যেমন হয়, অনেকটা যেন সেইরকম শোনাচ্ছে।

বসবার জায়গাটার ওপর দাঁড়াতেই রণজয়ের মুখ গোল গর্তটার কাছে পৌঁছে গেল।

সে বাংলাতেই চোঁচিয়ে বলল, তোমরা কে? কোথা থেকে কথা বলছ? আমি তোমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিশ্চয়ই রণজয়ের কথা ওরা শুনতে পেয়েছে, কেননা তক্ষুনি আরও এক গাদা কঁয়াকো ম্যাকো ট্যাকো ধরনের শব্দ ভেসে এল।

রণজয় বলল, আমি পৃথিবীর মানুষ। আমি শুধু বাংলা ভাষা জানি। আর একটু একটু ইংরেজি। তোমরা কি পৃথিবীর নাম শুনেছ?

আবার ভেসে এল সেই কঁয়াকো ম্যাকো ট্যাকো।

রণজয় বলল, দূর ছাই! এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

তখন সেও ওদের নকল করে কঁয়াকো ম্যাকো ট্যাকো ধরনের শব্দ করতে লাগল।

তাতেই ওদিককার শব্দ থেমে গেল হঠাৎ।

তারপর অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। রণজয় গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, কারা এরকমভাবে কথা বলছিল তার সঙ্গে। কত দূরে তারা আছে। জানলার দিকেও সে চোখ রেখেছে, যদি কিছু দেখা যায়।

যদি রণজয়ের মন ভালো থাকত, যদি খাবারদাবারের কোনও অভাব না থাকত, যদি বাড়ি ফিরে যাবার সবরকম সুবিধে থাকত, তা হলে এইরকম সময়ে বাইরের দৃশ্য দেখতেও খুব ভালো লাগত তার।

খুব নরম নীল আলো ছড়িয়ে আছে বাইরে। তার মধ্যে এখন কোথা থেকে উড়ে আসছে কমলা রঙের থোকা থোকা মেঘ। দূরে দেখা যাচ্ছে দুটো তারা, ঠিক হিরের মতন ঝকঝক।

সেই তারা দুটো ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। আরও একটু কাছে এলে বোঝা গেল, সে দুটো তারা নয়, দুটো উজ্জ্বল রকেট।

রণজয়ের মনে হল, ওরা নিশ্চয়ই তাকে তাড়া করে আসছে। ওরাই তা হলে কাঁয়াকো ম্যাকো ট্যাকো করেছিল।

রণজয় মরিয়া হয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে বোতাম টিপতে লাগল। যদি রকেটের মুখ অন্য দিকে ঘোরানো যায়। কিন্তু কোনওই লাভ হল না। কম্পিউটারে বারবার লাল আলো জ্বলতে লাগল।

ওই রকেটে কীরকমের প্রাণী আছে কে জানে? হয়তো তারা খুবই হিংস্র। লড়াই করবার মতন কোনও অস্ত্রও নেই রণজয়ের কাছে। বাবা-মা তার নাম রেখেছিলেন রণজয়, কিন্তু এরকম যুদ্ধে সে কী করে জিতবে!

রকেট দুটো আর একটু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল রণজয়ের রকেটের কাছে। ওদের রকেট অনেক বড়। ওদের দুটো চলে গেল দু'পাশে।

তারপর চলতে লাগল সমান গতিতে।

রণজয় ভাবল, ওরা কি তাকে বন্দি করবে, না দূর থেকে একটা অস্ত্র ছুড়ে পুরো রকেটটাই ধ্বংস করে দেবে! চলন্ত রকেট থেকে বন্দি করবে কী করে? কাছাকাছি এলেই তো ধাক্কা লাগবে।

তারপর রণজয় দেখল, ডান দিকের রকেটটা থেকে একটা সুতো ছুটে আসছে তার দিকে। ঠিক গুলিসুতোর মতন পাতলা, আসছে একেবারে সোজা। সেই সুতোটা তার রকেটে লাগতেই তার রকেটের গতি কমতে লাগল। একটু বাদে একদমই থেমে গেল।

রণজয় যাকে পাতলা গুলিসুতো ভাবছে, তা আসলে চুম্বক-আলো। এই চুম্বক-আলোর ব্যবহার পৃথিবীর মানুষ জানে না।

তারপর লাটাই গুটিয়ে যেরকম ঘুড়ি নামানো হয়, সেইরকম ভাবেই সেই সুতো টেনে টেনে রণজয়ের রকেটটা কাছে নিয়ে গেল ওরা।

এখন ওদের হাতে ধরা দেবার বদলে আর একটাই মাত্র পথ খোলা আছে। রকেটের দরজা খুলে রণজয় মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ঝাঁপানো মাত্রই অবশ্য সে মরে গিয়ে তার শরীরটা একটা শক্ত পাথরের টুকরোর মতন হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় অনন্তকাল ধরে ঘুরবে।

দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে রণজয় দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে।

দরজা কিন্তু তক্ষুনি খুলল না। রণজয়ের রকেটটা পুরোই ঢুকে গেল অন্য রকেটের পেটের মধ্যে। একটা বিরাট তিমিমাছ যেমন অন্য মাছ খেয়ে ফেলে, সেইরকম বড় রকেটটা খেয়ে ফেলল ছোট রকেটটাকে। তারপর আপনা আপনিই দরজা খুলে গেল।

মাত্র সাত জন প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। তাদের মানুষ বলা যায়, নাও বলা যায়। উচ্চতায় তারা তিন-চার ফুট মাত্র, তাদের পাগুলো খুব সরু সরু, পায়ের পাতা নেই বললেই চলে, পাখির মতন শুধু পাঁচটা আঙুল রয়েছে। শরীরও রোগা, হাতগুলো ছোট ছোট কিন্তু হাতের মুঠো বেশ বড়। মুখগুলো মানুষের মতন হলেও চোখগুলো অস্বাভাবিক বড়। কারুরই মাথায় চুল নেই। সবাই পরে আছে অয়েল

ক্লথের মতন জিনিসের চকচকে পোশাক। প্রত্যেকের হাতে একটা করে পিচকিরির মতন অস্ত্র।

কেউ কিছু কথা বলার আগেই ওদের একজন পিচকিরি থেকে খানিকটা আলো ছুড়ল, তাতেই ইলেকট্রিক শক খাবার মতন যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠল রণজয়। তার মাথা ঠুকে গেল নিজেরই রকেটের ছাদে।

রণজয় বুঝল, ওরা প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিতে চায়, ওদের কাছে কীরকম অস্ত্র আছে। কিংবা এটা খুবই সাধারণ। এর চেয়েও অনেক ভয়ংকর কিছু আছে ওদের কাছে।

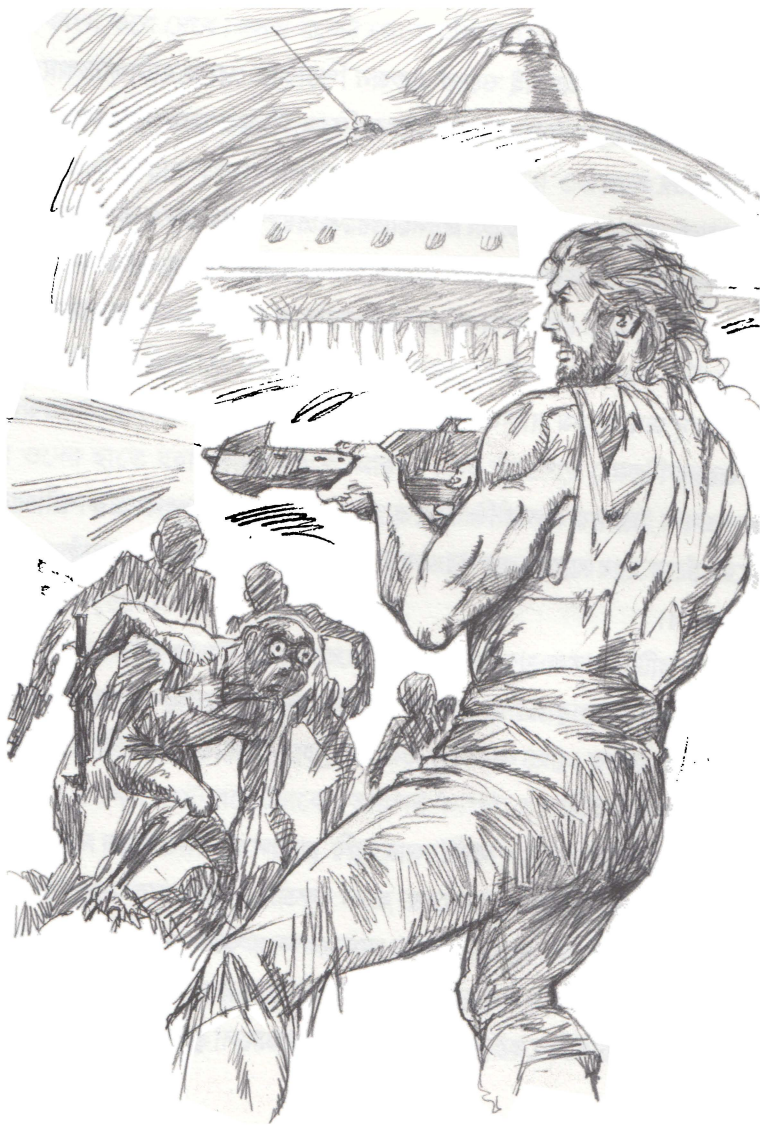
সে হাত দুটো সামনে এগিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে এক-পা এক-পা করে নেমে এল নীচে।

তখন আর দু'জন কাকুম সাকুম মাকুম ট্যাকো ম্যাকো বলে বকুনি দিয়ে আবার আলো ছুড়ল রণজয়ের দিকে।

রণজয় এবার যন্ত্রণায় ডিগবাজি খেতে লাগল। মনে হল যেন তার শরীরের সমস্ত হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। এরপর সবাই মিলে একসঙ্গে আলো ছুড়লে রণজয় সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে।

রণজয় ছেলেটি আসলে খুব গোঁয়ার। খুব রেগে গেলে তার ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে না। আর এইটুকু এইটুকু বাচ্চা বাচ্চা বেঁটে বেঁটে মানুষরা তাকে কষ্ট দেবে, এই অপমান সহ্য করে বেঁচে থেকে লাভ কী! তবু ওরা জানুক, পৃথিবীর মানুষ বীরের মতন লড়াই করে মরতে জানে।

উঠে দাঁড়িয়েই সে একসঙ্গে লাথি আর ঘুষি চালাল। তিন-চারজন তাতেই ধরাশায়ী হয়ে গেল একেবারে। যদিও রণজয়ের মতন অত বড় চেহারার মানুষের হাতে মার খেয়েও তারা মরে গেল না কিন্তু। কোনও ব্যথার শব্দও করল না। অন্য ক'জন রণজয়ের দিকে পিচকিরির আলো ছোড়ার চেষ্টা করতেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল রণজয়। সে নিজেও দুটো পিচকিরি কেড়ে নিয়ে ওদের দিকে আলো ছুড়ছে আর লাথিও চালাচ্ছে।



এক-একবার রণজয়ের গায়েও লেগে যাচ্ছে সেই আলো। কিন্তু সে অনবরত লাফাচ্ছে বলে পুরোটা লাগছে না।

এইরকম লড়াই চলল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু খুদে মানুষরা কেউ মরছে না। এমনকী রণজয় ওদের এক-একজনকে চ্যাংদোলা করে তুলে প্রাণপণ শক্তিতে ছুড়ে মারছে দেয়ালে, তবু ওদের মাথা ভাঙছে না, শরীরের কোথাও কেটে রক্তও পড়ছে না।

রণজয় বুঝতে পারল, এই লড়াইতে তাকেই হেরে যেতে হবে। এর মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এই সময় সেই রকেটের অন্য দিকের একটা দরজা খুলে গেল। তারপর শোনা গেল একটা তীব্র বাঁশির সুর। একই রকমের কয়েকজন খুদে মানুষ এসে ঢুকল প্রথমে। কিন্তু কে যে বাঁশি বাজাচ্ছে তা বোঝা গেল না। এরা অন্য রকেটটা থেকে এসে পড়েছে বুঝতে পেরে রণজয় লড়াই থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। আর কোনও আশা নেই!

সেই দ্বিতীয় দলের পেছনে পেছনে এল একটি মেয়ে, সে এদের চেয়ে অনেক লম্বা। প্রায় মানুষের কাছাকাছি, তবে এরও চোখ অস্বাভাবিক বড়।

তার হাতে কোনও বাঁশি নেই, সে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করছে, সেটাই বাঁশির মতন শোনাচ্ছে।

রণজয়কে দেখে সে অস্বাভাবিক চমকে উঠল। তার বড় বড় চোখ দুটি আরও বিস্ফারিত হয়ে গেল। সেটা ভয়ে না রাগে তা বুঝতে পারল না রণজয়।

সে খুব দ্রুত চিন্তা করল, এই মেয়েটিই নিশ্চয়ই এদের রানি। পিঁপড়াদের দলে যেমন একজন করে রানি থাকে, তার চেহারা অনেক বড় হয়, এদেরও নিশ্চয়ই সেইরকম।

বাঁশির শব্দ থামিয়ে মেয়েটি অন্যরকম একটা অদ্ভুত চিৎকার করতেই খুদে মানুষরা সবাই বসে পড়ল মাটিতে। অস্ত্র পাশে নামিয়ে রাখল।

মেয়েটিও মাটিতে বসে পড়ে খুব মিষ্টি গলায় কী যেন বলল রণজয়কে। কিন্তু সে এক বর্ণও বুঝল না।

রণজয় এক হাত নেড়ে জানাল সে ওদের ভাষা জানে না।

রণজয়ের হাত নাড়া দেখেই মেয়েটি মেঝেতে মাথা ঠেকাল, তার দেখাদেখি অন্য আর সবাই। তারপর সেই রানি মাথা তুলে আর একজন অনুচরকে কী যেন হুকুম করল।

সেই খুদে মানুষটি ছুটে গেল রকেটের ভেতরের দিকে। দুটো রুপোলি গোল বল নিয়ে ফিরে এল। একটা দিল তাদের রানির হাতে। আর-একটা নিয়ে এল রণজয়ের দিকে।

রণজয় প্রথমে বলটা নিতে দ্বিধা করল। একবার অন্য গ্রহের একটা বল ছুঁয়েই তো তার এই অবস্থা। আবার একটা বল ছুঁলে কী হয় কে জানে? যদি তার চেহারা এই মজার খুদে মানুষদের মতন হয়ে যায়? না, না, তা সে কিছুতেই চায় না।

সে হাত নেড়ে বলল, চাই না, চাই না।

তখন ওদের রানি সেই বলটা মুখের কাছে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, হে নীলদেবতা, আপনি এই জিনিসটা মুখের কাছে ধরলেই আপনার ভাষা আমরা বুঝতে পারব, আপনিও আমাদের ভাষা বুঝতে পারবেন।

বাংলা কথা শুনে এমনই চমকে গেল রণজয় যে সে আর কোনও দ্বিধা না করেই টপ করে তুলে নিল বলটা। কতকাল পরে সে বাংলা শুনল। কী অদ্ভুত যন্ত্র বানিয়েছে এরা। এর থেকে শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে অন্য লোকের গায়ে ধাক্কা মারলেই তা সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে।

রণজয় বলল, আপনারা কে? আমাকে বন্দি করতে চান কেন?

আশ্চর্য, রণজয় কিন্তু নিজের বাংলা কথাটা শুনতে পেল না। সেটা হয়ে গেল ওদের ভাষা।

রানি বলল, আপনাকে বন্দি করব? সে কী? আপনি তো আমাদের দেবতা। আপনার দেখা যে আজ পেয়েছি, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

রণজয় বলল, আমি দেবতা? না, না, তোমাদের ভুল হয়েছে। আমি পৃথিবী গ্রহের সামান্য একজন মানুষ!

রানি বলল, কেন আমাদের ছলনা করছেন প্রভু? আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে আছে, একদিন আমরা এই মহাশূন্যে আমাদের দেবতাকে খুঁজে পাব। তিনি উচ্চতায় আমাদের দ্বিগুণ। তাঁর গায়ের রং মহাশূন্যের মতো নীল, তাঁর মাথায় চুল আছে। তাঁর দেখা পেলে আমরা হব এখানকার গ্রহমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ জাতি। চলুন প্রভু, আমাদের গ্রহে চলুন, আপনাকে আমরা সব কিছু দিয়ে সেবা করব।

রানির কথা শেষ হওয়ামাত্রই সব খুদে মানুষরা হইহই করে উঠে রণজয়কে ঘিরে নাচতে লাগল।

রণজয়ের একেবারে ভাবাচ্যাকা অবস্থা। কোথায় সে এক্ষুনি মরতে বসেছিল, তার বদলে হয়ে গেল দেবতা? যা বাবাঃ! সবাই তাকে অনেক রকম খাবার এনে দিল, তাকে ঘিরে ঘিরে কীসব গান গাইতে লাগল।

এইরকমভাবে কতক্ষণ কাটল কে জানে? রণজয় একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর রানি তার কাছে এসে বলল, হে দেবতা, দেখুন, ওই আমাদের গ্রহ।

রণজয় জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখল, এদের গ্রহটি বেশ সুন্দর। অসংখ্য পাহাড় দেখা যায় আর হালকা হালকা কমলা রঙের মেঘ। গাছপালা অবশ্য চোখে পড়ল না।

রণজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, পৃথিবীতে তো আর ফেরা হবে না। তা হলে এই অচেনা গ্রহেই দেবতা কিংবা রাজা সেজে থাকা যাক। খাতির-যত্ন তো পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সুখভোগ রণজয়ের ভাগ্যে সইল না।

খুদে মানুষদের গ্রহে নেমে সে সবেমাত্র কয়েক পা হেঁটেছে, অমনি তার দম আটকে আসতে লাগল। যেন সে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। এখানকার বাতাস দারুণ ভারী।

বিদ্যুৎ চমকের মতন তার মনে পড়ল, এই গ্রহে গাছ নেই। এই গ্রহের হাওয়া মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যতই দৈত্যের মতন চেহারা হোক, সে আসলে মানুষ, অক্সিজেন ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে রানিকে বললে, আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। আমার

গ্রহ থেকে একটা যন্ত্র না আনলে আমি শ্বাস নিতে পারব না। তোমার কয়েকজন লোককে দাও আমার সঙ্গে। আমি রকেটে করে ঘুরে আসছি। আমার জন্য চিন্তা কোরো না, সময় হলে আমি ঠিক ফিরে আসব।

আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই, রণজয় টলতে টলতে উঠে পড়ল রকেটে। রানি তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিল।

খুদে মানুষরা যদিও পৃথিবীর নামও শোনেনি, তবে সূর্য নামে একটা ছোট তারার কথা তারা জানে। সেই হিসেবে খুঁজে খুঁজে ওরা একদিন পৌঁছোল পৃথিবীতে। সন্দের দিকে পৃথিবীতে নামল একটা রকেট।

রণজয় ভাবছে, এখন এই খুদে মানুষদের সে কী বলবে? তার পক্ষে তো আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, ওখানে ও একদিনও বাঁচবে না। এরা তাকে দেবতা ভেবেছে, কিন্তু সে দেবতার মতন অমর তো নয়।

সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে গেল।

খুদে মানুষেরা রণজয়ের সঙ্গে রকেট থেকে নামতেই ছটফট করতে শুরু করে দিল। পৃথিবীর বাতাস আবার তাদের একেবারেই সহ্য হয় না। ঠিক কাটা পাঁঠার মতন ধড়ফড় করতে লাগল তারা মাটিতে পড়ে।

রণজয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ওদের কোলে করে তুলে দিল রকেটে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, তোমরা চলে যাও। আমার সময় হলে আমি যাব। তোমাদের ভালো হোক।

তারপর রকেটটা উড়ে যেতেই রণজয় পৃথিবীর প্রতি প্রণাম জানিয়ে কাঁদোকাঁদো ভাবে বলল, মা, তুমিই আমার সবচেয়ে ভালো। তোমায় ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না!

.

নীল মানুষ ও ছোট বন্ধু

কেন যে মা ওকে জন্ম থেকেই আদর করে গুটুলি বলে ডাকত: সেই নামটাই ওর কাল হল।

গুটুলির বয়েস বাড়লেও তার শরীরটা আর বাড়ে না। তার যখন সাত বছর বয়েস তখন তাকে দেখাত চার বছরের ছেলের মতন। দশ বছর বয়েসে দেখাত সাত বছরের ছেলের মতন। চোদ্দো বছর বয়েসে তাকে সবাই মনে করত দশ বছরের ছেলে। তারপর যখন তার কুড়ি বছর বয়েস হয়ে গেল তখনও তার চেহারা দশ বছরের ছেলের মতোই রয়ে গেল। সবাই বলল, গুটুলি আর বাড়বে না। তার চেহারা ওইখানেই থেমে থাকবে।

গুটুলির বুদ্ধি কিন্তু ঠিকই বেড়েছে। এমনকী কুড়ি বছর বয়েসের সাধারণ ছেলেদের চেয়েও তার বুদ্ধি অনেক বেশি। সে মুখে মুখে শব্দ অঙ্ক কষে দিতে পারে। মানুষের মুখ দেখেই গুটুলি বলে দিতে পারে সে সত্যি কথা বলছে না মিথ্যে কথা। সে সাঁতার জানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে সাইকেল চালাতে পারে। ইংরেজি কাগজ পড়ে খেলার খবর বুঝতে পারে, তবু কেউ তাকে পুরোপুরি মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিতে চায় না।

তার একটা ভালো নামও আছে, তার পুরো নাম পরেশচন্দ্র মাইতি। কিন্তু ও নামটা কেউ মনে রাখে না। লোকেরা তাকে গুটুলি, গুটগুটে, গুলগুলিয়া এইসব যা ইচ্ছে নামে ডাকে। পাড়ার ছেলেরা যখন তখন চাঁটি মারে তার মাথায়। ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে ওঠার পর

অন্য ছেলেরা তাকে এমন জ্বালাতন-পোড়া তন করত যে সে ইস্কুলে পড়াই ছেড়ে দিল।

এমনকী গুটুলির ছোট ভাই বীরেশ, যার বয়েস ষোলো বছর, সেও তাকে দাদা বলে মানতে চায় না। যখন তখন হুকুম করে।

গ্রামের ছেলেদের অত্যাচারে গুটুলি এক-এক সময়ে কঁদে ফেললেও কেউ তাকে দয়া করে না, সবাই হাসতে শুরু করে তখন। কাঁদলে নাকি তার চেহারাটা আরও মজার দেখায়। সবাই তাকে আরও কাঁদাবার চেষ্টা করে।

এখন আর গুটুলি কাঁদে না। মনে মনে সঙ্কলের ওপর তার বিষম রাগ। গায়ের জোরে পারবে না জেনেও এক-এক দিন সে বড়সড় কোনও ছেলের দিকে রাগ করে তেড়ে যায়, পেটে ঘুষি মারে। তাতেও সবাই হাসতে হাসতে বলে, বামন খেপেছে! বামন খেপেছে! তারপর দু’-তিন জন মিলে গুটুলিকে চ্যাংদোলা করে তুলে জলে ফেলে দেয়।

গুটুলি একা একা কোনও জায়গায় বসে মনে মনে বলে, একদিন সব প্রতিশোধ নোব! একটা কোনও মন্ত পেয়ে আমার এমন গায়ের জোর হয়ে যাবে যে সবাই আমার কাছে মাথা নিচু করে থাকবে। তখন সবাই বুঝবি!

গুটুলিকে খুব ভালোবাসে তার মা। গুটুলিকে কেউ মারধর করলে বা খোঁচালে মা তাড়াতাড়ি এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, না রে লক্ষ্মীসোনা, কাঁদিস না! তুই একদিন ঠিক বড় হয়ে উঠবি। চেহারায় না হোস গুণে বড় হবি অন্যদের থেকে। তখন আর তোর কোনও দুঃখ থাকবে না!

গুটুলির যখন একুশ বছর বয়েস, তখন মাত্র দু’দিনের অসুখে ভুগে তার মায়ের মৃত্যু হল। ছোটবেলা থেকেই গুটুলি তার বাবাকে দেখেনি। পৃথিবীতে তাকে ভালোবাসার আর কেউ রইল না।

গুটুলি অঙ্ক আর হিসেবপত্তর ভালো জানে বলে পাশের গ্রামের একটা মুদিখানায় সে চাকরি পেল। এই কাজে তো গায়ের জোর লাগে না, বসে বসে জিনিসপত্র মাপা আর ঠিকঠাক দামের হিসেবপত্তর বুঝে নেওয়া। প্রথম প্রথম নতুন লোকেরা তাকে

ছেলেমানুষ ভেবে ঠকাবার চেষ্টা করত, কিন্তু সর্বের তেলের কিলো আঠেরো টাকা হলে দেড়শো গ্রামের দাম কত হয় তা গুটুলি এক মুহূর্তে বলে দিতে পারে। দু'টাকা বাষটি পয়সার জিনিস কিনলে কুড়ি টাকার নোট কত ফেরত দিতে হবে তা গুনতে তার একটুও ভুল হয় না।

দোকানের মালিক গুটুলির কাজে বেশ খুশিই ছিল। ওই দোকানঘরেই গুটুলি রান্তিরে শোয়, মালিকের বাড়ি থেকে তার জন্য দু'বেলা খাবার আসে।

এইরকমভাবে কয়েক মাস বেশ চলছিল। কিন্তু এই সুখও গুটুলির ভাগ্যে বেশিদিন সইল না।

একদিন দোকানের মালিক জিনিসপত্র কিনতে শহরে গেছে। গুটুলি একাই দোকান চালাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা দামোদর নামে একটা লম্বা মতন লোক এসে গুটুলিকে হাতছানি দিয়ে দোকানের বাইরে ডেকে বলল, এই বিটলে, পাঁচটা টাকা রোজগার করতে চাস?

গুটুলি বলল, আমার নাম বিটলে নয়। আমি কারও টাকাও চাই না!

দামোদর বলল, ও ভুল হয়েছে, তোর নাম গুটলে তাই না?

গুটুলি বলল, আমার নাম পরেশচন্দ্র মাইতি।

দামোদর বলল, ভাগ! এইটুকু চেহারার অতবড় নাম? যা বলছি তাই শোন! খবর পেয়েছি, আজ আর তোর ওই দোকানের মালিক শহর থেকে ফিরবে না। মাঝরান্তিরে তুই দোকানের দরজা ভেতর থেকে খুলে দিবি। সেজন্য তুই পাঁচ টাকা পাবি।

গুটুলি মানুষ দেখলেই চিনতে পারে। সেইজন্য সে আগে থেকেই জানে যে ওই দামোদর একটা চোর কিংবা ডাকাত। এর হাত থেকে বাঁচবার একটা উপায় করতে হবে।

সে বলল, দরজার অনেক উঁচুতে তালা। সেখানে আমার হাত যায় না। আমি কী করে দরজা খুলব?

দামোদর বলল, মালিক না থাকলে তালা লাগায় হারাধন। তারপর চাবি থাকে তোর

কাছে। সে খবর আমরা রাখি। তুই হারাধনকে বলবি তোর হিসি পেয়েছে, বাইরে যেতে হবে। ওকে চাৰি দিয়ে বলবি তালা খুলে দিতে। তারপর আমরা যা করবার করব।

গুটুলি বলল, তারপর মালিক এসে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তালা খোলার চাৰি দিল কে?

দামোদর বলল, আমরা তোর হাত-পা বেঁধে রেখে যাব। তা হলে তোর নামে দোষ পড়বে না। সব দোষ পড়বে হারাধনের নামে, বুঝলি? মনে থাকে যেন। ঠিক রাত্তির সাড়ে বারোটায়।

গুটুলি আর কিছু না বলে দোকানে ফিরে এল। হারাধন নামে আর যে একজন এই দোকানে কাজ করে, সে বোকাসোকা মানুষ। সেও এই দোকানে শোয়। মালিকের বাড়ি থেকে সে-ই গুটুলির জন্য খাবার এনে দেয়।

সেদিন খাওয়াদাওয়ার পর গুটুলি বলল, হারাধনদা, আজ রাত্তিরটা খুব সাবধানে থেকো। সারা রাত কিছুতেই দরজা খুলবে না। কেউ এসে দরজায় খুঁটখাট করলেই আমরা দু'জনে মিলে খুব চ্যাঁচাব, যাতে পাড়ার সব লোক ছুটে আসে। দু'জনকেই জেগে থাকতে হবে।

এই কথা বলল বটে, কিন্তু একটু পরেই ঘুমে টেনে এল গুটুলির চোখ। সে কিছু বুঝবার আগেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

গুটুলির ঘুম ভাঙল অনেক লোকের গোলমালে। ধড়মড় করে উঠে বসেই সে দেখল সকাল হয়ে গেছে। দোকান একেবারে ফাঁকা। সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। একপাশে পড়ে আছে হারাধন, তার হাত-পা-মুখ বাঁধা। দোকানের সামনে অনেক লোক ভিড় করে আছে।

গুটুলির খাবারের মধ্যে যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হারাধনকে যতটা বোকাসোকা সে ভেবেছিল, ততটা সে নয়। মানুষ চেনা অত সোজা নয়।

গুটুলির কথা কেউ বিশ্বাস করল না। সবাই ভাবল, গুটুলিই চোরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দরজা খুলে দিয়েছে। দোকানের মালিক ফিরে এসে ধপাধপ করে মারতে লাগল তাকে। কেউ বলল পুলিশে দাও! কেউ বলল বেঁটের গাঁটে গাঁটে শয়তানি বুদ্ধি!

শেষ পর্যন্ত পুলিশে দেওয়া হল না বটে কিন্তু দোকানের মালিক তাড়িয়ে দিল তাকে গ্রাম থেকে।

গ্রামের বাইরে একটা তালগাছের নীচে দাঁড়িয়ে গুটুলি প্রতিজ্ঞা করল, একদিন সে ফিরে এসে প্রতিশোধ নেবে। ওই দামোদর, হারাধন, দোকানের মালিক কারুকে ছাড়বে না!

২

মনের দুঃখে বনে চলে গেল গুটুলি।

তা বনে যাওয়াও কি সোজা? জনমানবহীন সেরকম ঘন জঙ্গলও তো আজকাল বেশি নেই। নিজের গ্রাম আর পাশের দু’-তিনখানা গ্রাম ছাড়া আর কোথাও কখনও সে যায়নি। তবু গুটুলি ঠিক করেছিল সে আর কোনওদিন নিজের গ্রামে ফিরে যাবে না। মানুষের হাতে অপমান আর অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে বনে গিয়ে বাঘ-সিংহের পেটে যাওয়া ভাল।

গ্রামের বাইরে মাঠের শেষে যেখানে আকাশ এসে মিশেছে সেই দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল সে। একটার পর একটা মাঠ পেরিয়ে যায় তবু আকাশ কাছে আসে না।

মাঠ পেরিয়ে গ্রাম আসে, কিন্তু গুটুলি কোনও গ্রামে ঢোকে না। সে আর কোনও মানুষকে বিশ্বাস করে না। তার চেহারা ছোট, তার গায়ে জোর নেই বলে কেউ তাকে গ্রাহ্য করে না! কিন্তু তার বুদ্ধি আছে।

বনে গিয়ে গুটুলি তপস্যা করবে। আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা তপস্যার জোরে দেবতাদের কাছ থেকে কত রকমের বর পেয়েছে। একালেও বা সেরকম হবে না কেন? গুটুলি এমন কঠোর তপস্যা করবে যে কোনও না কোনও দেবতাকে আসতেই হবে। সে লম্বা হবার বর চাইবে।

ঠিক মতন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, গুটুলি হাঁটতেই লাগল। সে পরে ছিল একটা খাকি হাফপ্যান্ট আর কলার দেওয়া নীল গেঞ্জি। প্যান্টটা ছিঁড়ে গেল ফালাফালা হয়ে, ধুলোকাদা মেখে গেঞ্জিটা এমন হল যে রং চেনাই যায় না। খুব তেষ্টা পেলে সে নদীর জল খায়, খিদে পেলে কবে সে ভালো ভালো খাবার খেয়েছে সেসব কথা চিন্তা করতে করতে তেঁতুল গাছের পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

এইভাবে কতদিন কেটে গেল কে জানে। একসময় গুটুলি একটা জঙ্গল দেখতে পেল। প্রথমে জঙ্গলটা পাতলা পাতলা, এখানে ওখানে কয়েকটা করে গাছ। কাছাকাছি কিছু লোকের বাড়ি-ঘরও আছে। কিন্তু যতই সে ভেতরে ঢুকতে লাগল ততই জঙ্গলটা খুব গভীর। গুটুলি আরও ভেতরে যেতে চায়, যেখানে কোনও মানুষজন যায় না।

দিনের বেলা জঙ্গলে প্রায় কোনও সাড়াশব্দ থাকে না। সন্দের পরই জঙ্গল যেন জেগে ওঠে। ডাকতে থাকে অসংখ্য ঝিঁঝিপোকা। শুকনো পাতার ওপর খসখস, সরসর শব্দ হয়। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় আলোর ফুটকি, সেগুলি জোনাকি না বাঘ-ভালুকের চোখ তা বোঝার উপায় নেই।

গুটুলি খুব একটা ভয় পেল না। সে তো জানেই বনে অনেক বিপদ আছে। কিন্তু বনে অপমান নেই।

অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে আন্দাজে একটা গাছ খুঁজে নিয়ে গুটুলি সেই গাছ বেয়ে উঠে গেল ওপরের একটা মোটা ডালে। তারপর সেখানে বসে রইল। প্রথম রাতটা এইভাবে কাটুক, তারপর কাল সকালের আলোয় বনটা ভালো করে দেখে নিতে হবে। একটা নিরাপদ থাকার জায়গা পাওয়া যাবেই। খিদেয় তার পেট জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু

গুটুলি ভাবল জঙ্গলে কতরকম ফলের গাছ থাকে, কাল দিনের বেলা কিছু না কিছু জুটে যাবেই।

মাঝে মাঝে গাছের তলায় কীসব জন্তু যেন দৌড়ে যাচ্ছে। খরগোশ, হরিণ কিংবা চিতাবাঘও হতে পারে। একবার ধপ ধপ শব্দ করে কী যেন হেঁটে গেল। হাতি নাকি? আওয়াজটা ঠিক মানুষের হাঁটার মতন। কিন্তু মানুষ হাঁটলে তো অত জোর শব্দ হয় না!

একবার গুটুলির উরুর ওপর কী যেন একটা ঠান্ডা ঠান্ডা লাগল। তারপর ফোঁস ফোঁস শব্দ। নিশ্চয়ই সাপ। গুটুলি জানে সাপকে বিরক্ত না করলে সাপ সহজে কামড়ায় না। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। সাপটা চলে গেল তার গায়ের ওপর দিয়ে।

রাত শেষ হয়ে যেই ভোরের আলো ফুটল, অমনি বদলে গেল সবকিছু। দিনের আলোয় বনের মধ্যে একটুও ভয় থাকে না। কতরকম ফুল ফুটেছে, কত পাখি ডাকছে। পাখিগুলো যে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যেই যেন কত আনন্দ।

গুটুলি গাছ থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা জায়গা ঘুরে দেখল। এক জায়গায় অনেকগুলো জামগাছ। সেইসব গাছ একেবারে কালোজামে ভরে আছে। সেই কালোজাম খেয়েই পেট ভরিয়ে ফেলল সে। তারপরেই দেখল আর কয়েকটা বাতাবি লেবুর গাছ। গুটুলি ভাবল, থাক, ওগুলো বিকেলে খাওয়া যাবে।

এই জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ও আছে। এক জায়গায় পাশাপাশি দুটো ছোট ছোট টিলা, নরম ঘাসে ঢাকা। একটা টিলার গায়ে একটা গুহার মতন রয়েছে। ওখানে অনায়াসে রাঙিরে থাকা যাবে। জায়গাটা গুটুলির বেশ পছন্দ হল।

এইবার আসল কাজ শুরু করতে হবে। একটা গাছের তলায় সে বসল গুছিয়ে। সামনেই অন্য টিলাটার মাথায় সূর্য উঠেছে। হাওয়া দিচ্ছে মিষ্টি মিষ্টি। জ্ঞান হবার পর থেকে গুটুলির এত ভালো আর কোনওদিন লাগেনি।

হাতজোড় করে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, হে ঠাকুর, দেখা দাও! আমি মন্ত্র জানি না! কী করে তপস্যা করতে হয় তা জানি না। তবু একবার দেখা দাও!

আমি বেশি কিছু চাইব না, শুধু একটাই জিনিস চাইব...

এই কথাগুলোই সে বলতে লাগল বারবার। একসময় তার চোখ বুজে এল। তবু কথাগুলো বলে যেতে লাগল ঠিকই।

হঠাৎ একসময় কে যেন প্রচণ্ড গর্জনে বলে উঠল, এই!

ভয়ে একেবারে কেঁপে উঠল গুটুলি। কে চ্যাঁচাল। মানুষেরই গলার মতন, কিন্তু মানুষের গলা কি এত জোর হতে পারে? ঠিক যেন বাজ পড়ল আকাশ থেকে।

গুটুলি দেখল তার সামনে একটা বিরাট মানুষের ছায়া। আরও মুখ তুলে দেখল, টিলার মাথায় প্রকাণ্ড বড় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন আকাশ থেকে নেমেছে। মানুষটির গায়ের রং একেবারে ঘন নীল।

তা হলে গুটুলির ডাক শুনে এত তাড়াতাড়ি স্বর্গ থেকে নেমে এল কোনও দেবতা! কিন্তু দেখলে যেন দেবতার বদলে দৈত্য বলেই মনে হয়। খালি গা, বুকে বড় বড় লোম, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা।

সেই প্রকাণ্ড মানুষটি কয়েকটা লাফ দিয়ে চলে এল একেবারে গুটুলির সামনে। মাথাটা নুইয়ে গুটুলির দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রে, তুই এইটুকুনি বাচ্চা ছেলে। একা একা এই জঙ্গলে কী করছিস?

গুটুলি বলল, আমি বাচ্চা ছেলে নই, আমার বয়েস একুশ বছর। প্রভু, আমি আপনার দয়া চাইতেই এখানে এসেছি!

প্রকাণ্ড লোকটি বলল, আমার কাছ থেকে দয়া চাইতে এসেছিস? তুই কী করে জানলি আমি এখানে থাকি?

প্রভু, আমি যে জানি, মন দিয়ে ডাকলে দেবতারা আকাশ থেকে নেমে আসে।

দৈত্যটা বাতাস কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর হাঁটু গোড়ে বসে পড়ে বলল, আমি প্রভু ট্রুডু কেউ নই। আমি তোদেরই মতন একজন মানুষ। আমার নাম রণজয়।

গুটুলি তবু হাতজোড় করে বলল, কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছেন প্রভু? আমি

জানি আপনি আকাশ থেকে এসেছেন। আগে তো কখনও আমি দেবতা দেখিনি। আপনার গায়ের রং নীল। রামায়ণ বইতে আমি শ্রীরামচন্দ্রের গায়ের রংও নীল দেখেছি। ক্যালেন্ডারে শ্রীকৃষ্ণেরও গায়ের রং নীল থাকে। প্রভু, আমি শুধু আপনার কাছে একটা বর চাইব।

লোকে যেমন পুতুল নিয়ে আদর করে সেইরকম ভাবে প্রকাণ্ড লোকটি এক হাতে গুটুলিকে তুলে নিয়ে এল মুখের কাছে। তারপর বলল, এবারে তোকে এক কামড়ে খেয়ে ফেলি?

গুটুলি বলল, যদি ইচ্ছে হয় তো তাই করুন। বর না পেলে আমি এমনিই তো আর ফিরে যাব না ঠিক করেছি!

প্রকাণ্ড মানুষটি বলল, আশ্চর্য! সবাই আমায় দেখলে ভয়ে পালায়। এত কাছাকাছি এলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আর এই ছোট্ট মানুষটা একটুও ভয় পাচ্ছে না। তুই কী বর চাইতে এসেছিস এই জঙ্গলে।

গুটুলি বলল, প্রভু, আপনি শুধু আমাকে লম্বা হবার বর দিন। একুশ বছরের ছেলেরা যত বড় হয়, তার চেয়েও বেশি লম্বা করে দিন।

মোষের মতন ফোঁস শব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীল মানুষটি বলল, হায় রে, লম্বা হবার যে কী দুঃখ তা তো তুই জানিস না! আমার কাহিনি শুনবি? আমার নাম রণজয়। আমারও বয়েস এখন একুশ। অনেকদিন আগে আকাশ থেকে একটা গোল জিনিস খসে পড়েছিল, সেটা ছোঁয়ার ফলেই আমার এই অবস্থা। তারপর থেকেই আমার গায়ের রং নীল হয়ে যায়, আর আমার শরীরটা বাড়তে থাকে। বেড়ে বেড়ে এতখানি হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রায় ডবল। আরও কত লম্বা হব কে জানে! এই চেহারার জন্য আমি মানুষের সামনে যেতে পারি না। আমার মা বাবাও আমায় চিনতে পারে না! ওঃ, লম্বা হবার কী কষ্ট তুই কী বুঝবি!

লম্বা নীল মানুষ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আর তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল গুটুলি।

কান্না থামিয়ে নীল মানুষ বলল, এ কী, হাসছিস কেন?

গুটুলি বলল, হাসব না? কী অদ্ভুত মিল আমাদের দু'জনের। আমি বেঁটে বলে সবাই আমায় অত্যাচার করে, তাই আমি সবকিছু ছেড়ে জঙ্গলে চলে এসেছি। আর আপনি লম্বা বলে আপনার এত দুঃখ, আপনাকে দেখলে লোকে ভয় পায়। আপনি মানুষের কাছে যেতে ইচ্ছে করলেও যেতে পারেন না।

ঠিক বলেছিস। তুই খুব ভাল ছেলে রে। তুই এই জঙ্গলে থাকবি আমার কাছে?

জঙ্গল ছাড়া আর তো কোনও জায়গায় আমার থাকার জায়গা নেই।

সেই ভালো, আজ থেকে আমরা দু'জনে বন্ধু হলাম।

গুটুলি বলল, আমি যা পারিনি তুমি তা পারবে। তুমি যা পারোনি আমি তা পারব! এতদিন আমার একজনও বন্ধু ছিল না। জঙ্গলে দেবতা খুঁজতে এসে পেয়ে গেলুম বন্ধু।

৩

কয়েকদিন পরে জঙ্গল থেকে আবার বেরিয়ে এল গুটুলি।

এখন সে পরে আছে সন্ন্যাসীদের মতন গেরুয়া কাপড়, মাথায় পাগড়ি, এক হাতে একটা কমন্ডুলু আর অন্য হাতে ত্রিশূল। জঙ্গলের মধ্যে অনেক কালের একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেইখানে এইসব জিনিস পেয়েছে।

মাঠঘাট পেরিয়ে সে একটা বড় গ্রামে ঢুকল। এখন তার মুখ চোখের চেহারাটাই অন্যরকম। সে আর মানুষজনদের ভয় পায় না। সন্ন্যাসী দেখলে গ্রামের মানুষ এখনও বেশ খাতির করে, তা সে সন্ন্যাসী বেঁটে হোক বা লম্বা হোক, রোগা কিংবা মোটা যাই হোক।

বোম ভোলানাথ! জয় শঙ্কর। এইসব বলতে বলতে গুটুলি সেই গ্রামের শ্মশানঘাটে একটা গাছতলায় গিয়ে বসল।

সেই শ্মশানে আগে থেকেই আর একজন সাধু ছিল। তার বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, মুখ ভরতি দাড়ি, মাথায় জটা, চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। তার সামনে বসে আছে দু'-তিনজন ভক্ত!

বড় সাধু খানিকক্ষণ এই বাচ্চা সাধুকে আড়চোখে দেখল। তারপর একসময় হুংকার দিয়ে বলল, অ্যাঁই, তুই আমার জায়গায় কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলি রে? তুই কার চালা?

গুটুলি একটুও ভয় না পেয়ে বেশ তেজের সঙ্গে বলল, আমি বোম ভোলানাথের চালা!

বড় সাধু বলল, হুঁঃ! নাক টিপলে দুধ বেরোয়, এর মধ্যে ভেক্ ধরেছিস? ভালো চাস তো এদিকে আয়, আমার পা টিপে দে!

গুটুলি গম্ভীরভাবে বলল, আমি তোমার থেকে বয়েসে বড়! একবার বলেছ বলেছ আর দ্বিতীয়বার ওরকম কথা বোলো না!

বড় সাধু বলল, অ্যাঁ! কী বললি?

গুটুলি বলল, কানে ভালো শুনতে পাও না বুঝি? বললুম যে আমি তোমার থেকে বয়েসে অনেক বড়। আমার নাম দীর্ঘাচার্য। আমার বয়েস তিনশো তিন বছর।

গুটুলির উচ্চতা মোটে সাড়ে তিন ফুট আর তাকে দেখতে দশ বছরের ছেলের মতন। তার মুখে এই কথা শুনে বড় সাধুর সামনে বসে থাকা ভক্ত ক'জন ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

বড় সাধু রেগে গিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু এই সময় একদল লোক হইহই করে একটা মড়া নিয়ে এল। তার পেছনে পেছনে আর এক দল লোক এল কাঁদতে কাঁদতে। সুতরাং দুই সাধুতে তখন আর কোনও কথা হল না।

গুটুলি চোখ বুজে ব্যোম শঙ্কর, ব্যোম ভোলানাথ বলতে লাগল আবার।

গ্রামে রটে গেল যে শ্মশানে একটা বাচ্চা সাধু এসেছে, সে বড় সাধুর মুখে মুখে কথা বলে।

অনেকে দেখতে এল এই নতুন সাধুকে। কিন্তু গুটুলি সেই যে চোখ বুজেছে, আর চোখও খোলে না, কারও সঙ্গে কথাও বলে না। তা দেখে লোকের ভক্তি বেড়ে গেল। কেউ বলল, সাধুর মুখ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে। কেউ বলল, হ্যাঁ, দেখলেই বোঝা যায়, এ সাধুর বয়েস তিনশো বছরের বেশি!

সন্দের পর শ্মশান খালি হয়ে গেল। ভূতের ভয়ে রাত্তিরের দিকে এদিকে কেউ আসে না। অন্ধকার হয়ে যাবার পর বড় সাধু কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালল। গুটুলি তখনও চক্ষু বুজে আছে।

বড় সাধু তার কাছে এসে বলল, আর ভড়ং করতে হবে না। এইবার বল দেখি, তুই কে? বাড়ি থেকে বাপ মা'র ওপর রাগ করে পালিয়ে এসেছিস, তাই না?

গুটুলি বলল, আমার বাবা মা কেউ নেই। তিনশো তিন বছর আগে আমার জন্ম। একশো বছর অন্তর অন্তর আমার চেহারা ছোট হয়ে যায়, আবার বাড়ে। আবার ছোট হয়, আবার বাড়ে। এবারে বুঝলে?

বড় সাধু বলল, আমার কাছেও বুজরুকি, অ্যাঁ?

বলেই সে গুটুলির ঘাড় ধরে মাটি থেকে টেনে তুলল। তারপর বলল, আমি আসলে কে জানিস? আমার নাম রঘু সরদার। আমার নাম শুনলে পঞ্চাশটা গ্রামের লোক এখনও ভয়ে কাঁপে। শোন, আমার সেবা-যত্ন করলে এখানে থাকতে পারবি। নইলে তোর টুঁটি টিপে নদীর জলে ফেলে দেব।

গুটুলি বলল, ঠিক আছে, তোমার সেবায়ত্ন করব। যত চাও! আগে নদীতে স্নান সেরে আসি, কিছু খেয়েটেয়ে নিই। তবে একটা কথা বলে রাখি। কারও চেহারা ছোট হলেই তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখাতে নেই!



বড় সাধু ছেড়ে দিতেই গুটুলি নদীর ধারে নেমে গেল। তারপর চৈঁচিয়ে চৈঁচিয়ে গান ধরল, ‘কে বিদেশি মন-উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে!’

রাত ঘোর হবার পর সেখানে এসে হাজির হল নীল মানুষ। গুটুলির গান শুনে নদীর ধারে পৌঁছে বলল, কী বন্ধু? সব ঠিকঠাক আছে তো?

গুটুলি বলল, বন্ধু, আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নাও!

নীল মানুষ ঝুঁকে পড়ে গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধে, গুটুলি দু’দিকে পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর বলল, এবারে চলো তো বন্ধু, যেখানে আগুন জ্বলছে!

বড় সাধু ধুনির আগুনে হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রান্না করছিল, মাটির ওপর ধপ ধপ করে আওয়াজ হতে সে চমকে মুখ তুলে তাকাল।

গুটুলি বলল, এই যে সাধুজি, পা টেপাবে বলছিলে, কই পা বার করো!

ধুনির আগুনের অস্পষ্ট আলোয় বড় সাধুর প্রথমে মনে হল বাচ্চা সাধুটা যেন তালগাছের মতো লম্বা হয়ে গেছে। তারপর সে দেখল কলাগাছের মতন দুটো পা, তাতে আবার নীল রং!

বড় সাধু আঁতকে চৈঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে! ব্রহ্মদৈত্য এসেছে রে! মরে গেলাম রে!

তাই শুনে নীল মানুষ হাসি চাপতে পারল না। তার হাসিতে গমগম করে উঠল জায়গাটা।

বড় সাধু উঠে এক লাফ মেরে দৌড়োল অন্ধকারের মধ্যে আর চিৎকার করতে লাগল বাঁচাও! বাঁচাও! ভূত, ব্রহ্মদৈত্য!

নীল মানুষ লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে তাকে ধরে ফেলে বলল, যাচ্ছ কোথায়?

গুটুলি বলল, তোমার সেবা করতে এসেছি, তুমি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছ?

দু’রকম গলার আওয়াজ শুনে বড় সাধু আরও ভয় পেয়ে বলতে লাগল, মরে গেলাম! মরে গেলাম! মরে গেলাম!

গুটুলি নীল মানুষের গা বেয়ে সরসর করে নেমে এল নীচে। তারপর ধমক দিয়ে বলল, আঃ, বড্ড চ্যাচাচ্ছ! এবারে চুপ করো! নইলে সত্যি গলা টিপে দেব!

চিৎকার থামিয়ে বড় সাধু একবার গুটুলিকে আর একবার নীল মানুষকে দেখতে লাগল। তার মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে।

নীল মানুষ বলল, তুমি সাধু-মানুষ হয়ে এত ভয় পাচ্ছ কেন? তোমাদের তো ভূতপ্রেত দেখেও ভয় পাবার কথা নয়!

বড় সাধু হাতজোড় করে বলল, আমায় ক্ষমা করে দাও! আমায় তোমরা প্রাণে মেরো না! আমি আসল সাধু নই। আমার নাম রঘু সরদার।

গুটুলি বলল, তুমি সাধু নও! তোমার আসল নাম রঘু সরদার, তার মানে তুমি কীসের সরদার?

রঘু সরদার বলল, আগে আমার ডাকাতদল ছিল। কিছুদিন হল পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য আমি সাধু সেজে আছি!

গুটুলি বলল, প্রথমেই যে এরকম একজনকে পেয়ে যাব তা আশাই করিনি! বন্ধু, এবারে একে নিয়ে কী করা যায় বলো তো!

নীল মানুষ বলল, ওর হাড়গোড় ভেঙে দ করে দিতে পারি। কিংবা ওর পা দুটো গাছের ডালে বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দিতে পারি। কিংবা ওকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বাঘের সামনে ফেলে দিতে পারি। কিংবা ওকে ক্ষমাও করে দিতে পারি! তুমি কোনটা চাও?

রঘু সরদার নীল মানুষের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, ওগো ব্রহ্মদৈত্য, আমায় ক্ষমা করে দাও! আমি আর কোনও দিন চুরি-ডাকাতি করব না!

নীল মানুষ বলল, আমার পায়ে ধরলে হবে না। আমার বন্ধুর পায়ে ধরতে হবে!

রঘু সরদার তক্ষুনি পেছন ফিরে গুটুলির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর বলতে লাগল, ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও!

গুটুলি খানিকটা সরে গিয়ে বলল, আঃ আজ বড্ড আনন্দ হল। এর আগে কেউ আমার কাছে ক্ষমা চায়নি। ওহে রঘু সরদার, ওঠো, তোমায় ক্ষমা করে দিলুম।

নীল মানুষ বলল, সে-ই ভালো! কী সুন্দর ভাতের গন্ধ আসছে! কোথায় যেন ভাত রান্না হচ্ছে।

ধুনির আগুনে রঘু সরদারের চাপানো হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। সেইদিকে তাকিয়ে গুটুলি বলল, সত্যি, কতদিন ভাত খাইনি। ফলটল খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে গেছে। ওহে রঘু সরদার, তোমায় যে ক্ষমা করে দেওয়া হল, তার বদলে আমাদের ভাত খাওয়াও!

রঘু সরদার বলল, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! ভাত, আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ, কাঁচা লঙ্কা...ঘি-ও আছে। তোমার এই ব্রহ্মদৈত্য কি ঘি খায়?

নীল মানুষ হাসতে হাসতে বলল, আমি সব খাই! আগে মানুষের মাংস খেতাম, এখন শুধু সেটা ছেড়ে দিয়েছি।

রঘু সরদার রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গুটুলি আর নীল মানুষ পাশাপাশি বসল আগুনের ধারে।

গুটুলি রঘু সরদারকে বলল, আমরা দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাদের মতন বদমাশ লোকদের ক্ষমা চাওয়াব। তুমি হলে এক নম্বর!

নীল মানুষের সংসার

রঘু সরদার আগে ছিল ডাকাত, পরে সে পুলিশের ভয়ে সাধু সেজেছিল। এখন সে হয়েছে রান্নার ঠাকুর। সে গুটুলি আর নীল মানুষের জন্য রোজ ভাত-ডাল রান্না করে।

রঘু সরদারের মনে বড় দুঃখ। সে এখনও বুড়ো হয়নি, তার গায়ে জোর আছে, তবু তাকে কিনা জঙ্গলের মধ্যে বন্দি থেকে এরকম একটা ছোট কাজ করতে হয়! যখন সে ডাকাতের সর্দার ছিল তখন তার দলের দশ-বারো জন লোক তার হুকুম শুনত, গ্রামের লোক তার নাম শুনে ভয়ে কাঁপত, মাঝ রাত্তিরে মশাল নিয়ে রে রে রে করে গ্রামের কোনও বাড়িতে চড়াও হলে সে বাড়ির লোক টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি সব ফেলে দিত তার পায়ের কাছে। কত আনন্দ ছিল তাতে।

সাধু সেজে থাকার সময়েও কম আনন্দ ছিল না। দলের তিনজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার নাম বলে দেওয়ায় কিছুদিনের জন্য তাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। অন্য গ্রামে এসে শ্মশানের ধারে সাধু সেজে বসলে গ্রামের মানুষ বেশ ভক্তি করে, পুলিশেও বিরক্ত করে না। সাধু-সাজা অবস্থায় রঘু সরদারের খাওয়া দাওয়া বেশ ভালোই জুটছিল, ভক্তদের হুকুম করলে তার পা টিপে দিত। এখন কিনা ওই বেঁটে বাঁটকুল গুটুলির হুকুম শুনতে হয় তাকে। এমনকী গুটুলির পা-ও টিপে দিতে হয় মাঝে মাঝে।

এখান থেকে পালাবারও কোনও উপায় নেই। রঘু সরদার বুঝতে পেরেছে যে, পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লে ওই আট ফুট লম্বা নীল মানুষ শুধু তাকে তুলে একটা

আছাড় দিলেই সব শেষ। রঘু সরদারের এখনও ধারণা, নীল মানুষ ঠিক মানুষ নয়, ব্রহ্মদৈত্য জাতীয়ই কিছু হবে। গায়ের রং আবার গাঢ় নীল রঙের। তবে নীল মানুষের স্বভাবটা তেমন হিংস্র নয়, বেশির ভাগ সময়েই শুষে-বসে আলস্য করে আর হাসি-ঠাট্টা করে কথা বলে। বরং ওই মাত্র তিন ফুট চেহারার গুটুলিটাই পাজি, ওর গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। নীল মানুষ ওর বুদ্ধিতেই চলে। ওই গুটুলিই ঠিক করেছে যে, রঘু সরদারকে পুরো এক বছর জঙ্গলে থেকে ওদের সেবা করতে হবে। তারপর যদি সে নাক-কান মূলে প্রতিজ্ঞা করে যে, আর কোনওদিন ডাকাতি করবে না, কিংবা সাধু সেজে লোককে ঠকাবে না, তা হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রঘু সরদার মনে মনে উপায় খোঁজে, কী করে ওই গুটুলিটাকে জব্দ করা যায়।

সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর রঘু সরদার ঝরনার পাশে বাসন মাজতে বসল। এটাও তাকে করতে হয়। এই সময়টায় তার সবচেয়ে বেশি রাগে গা জ্বলে যায়। সে ছিল কিনা একজন নামকরা ডাকাত সরদার। তাকে এখন মেয়েদের মতন বাসন মাজতে হচ্ছে।

সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল নীল মানুষ একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে আর গুটুলি একটু দূরে বসে একখানা বই পড়ছে। গুটুলি প্রায়ই একা-একা শহরে যায়, আর নানান জিনিসপত্তর জোগাড় করে আনে।

বই থেকে মুখ তুলে গুটুলি বলল, বড্ড পান খেতে ইচ্ছে করছে। কতদিন পান খাইনি। রঘু, কয়েক খিলি পান এনে দাও তো।

রঘু সরদার বলল পান? এই জঙ্গলের মধ্যে আমি পান কোথায় পাব?

গুটুলি বলল, জঙ্গলের মধ্যে পান পাওয়া যাবে না, জানি। কিন্তু বাঁদিকে এই টিলার পাশ দিয়ে মাইল তিনেক হেঁটে গেলেই একটা বড় রাস্তা পাবে। একটা হাইওয়ে। সেখানে একটা পেট্রল পাম্পের পাশেই একটা পান-বিড়ির দোকান আছে। সেখান থেকে নিয়ে এসো।

রঘু সরদার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একলা পান আনতে যাব?

গুটুলি তার দিকে একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, যাও, পান নিয়ে এসো। বেশি দেরি কোরো না যেন।

রঘু সরদারের ভুরু কপালের অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। সে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না। তাকে একলা একলা পাঠানো হচ্ছে জঙ্গলের বাইরে? সেইখানে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি-ট্রাক চলে। কোনও একটা ট্রাকে উঠে তো সে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে পারে।

গুটুলি কি তাকে লোভ দেখাচ্ছে?

একটা হ্যান্ডব্যাগে রঘু সরদারের কিছু লুকোনো টাকা ও কয়েকটা জামাকাপড় রয়েছে। রঘু সরদার একবার সেদিকে তাকাল। ওই ব্যাগটার মায়া ত্যাগ করতে হবে।

মেঘের গর্জনের মতন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে নীল মানুষ। সে সহজে জাগবে না মনে হয়।

রঘু সরদার বলল, ঠিক আছে তা হলে পান নিয়ে আসি।

গুটুলি বলল, বেশি দেরি কোরো না কেমন? আর হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি দামোদর বলে কারুকে চেনো?

রঘু সরদার বলল, দামোদর? কোন দামোদর?

গুটুলি বলল, তোমারি মতন ডাকাতিটাকাতি করে?

রঘু সরদার জিজ্ঞেস করল, তার কি বাঁ হাতের দুটো আঙুল কাটা? কথা বলতে বলতে হঠাৎ তোতলা হয়ে যায়?

ঠিক ধরেছ। সেই দামোদরই বটে!

সে তো একসময় আমার দলেই ছিল। পরে নিজের আলাদা দল খুলেছে, শুনেছি। তাকে তুমি চিনলে কী করে?

চেনা হয়েছিল একসময়। তুমি যে দোকানে পান কিনতে যাচ্ছ দামোদরই এখন সেই দোকানের মালিক।

এঃ, ব্যাটা ডাকাতি ছেড়ে এখন পানওয়ালা সেজেছে।

ডাকাতি ছাড়েনি! তুমি যেমন পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য কিছুদিন সাধু সেজেছিলে, ওই দামোদরও তেমনি পানওয়ালা সেজেছে! তুমি ওই দামোদরকে এখানে ডেকে আনতে পারবে?

এখানে?

হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

কথা শুনলে, পিণ্ডি জ্বলে যায়। ওইটুকু একটা মানুষ যাকে রঘু সরদার টিপে মেরে ফেলতে পারে, সে কিনা বসে বসে হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে! ব্রহ্মদৈত্যটাকে ও কী করে বশ করল কে জানে!

রঘু সরদার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা হেঁটে তারপর দৌড়োতে শুরু করল। মাঝে মাঝে সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে যে, নীল মানুষ তাকে তাড়া করে আসছে কি না! না সেরকম কোনও চিহ্ন নেই। বন একেবারে নিস্তব্ধ।

ছুটতে ছুটতে সে ভাবতে লাগল, বড় রাস্তায় পৌঁছে সে কী করবে? দামোদরের সঙ্গে দেখা করবে? কী দরকার? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সোজা একটা গাড়িতে উঠে পালিয়ে যাওয়াই তো ভালো।

হাতে একটা কোনও অস্ত্র নেই, সঙ্গে কোনও টাকাপয়সা নেই, শুধু মাত্র একটা টাকা সম্বল। তবু রঘু সরদার ঠিক করল, এবারে সে পালাবেই।

সে বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল বিনা বাধায়। পেট্রল পাম্পটাও চোখে পড়ল। তার পাশে একটা পানের দোকান আছে ঠিকই। রঘু সরদার আড়াল থেকে দেখল, আঙুল-কাটা দামোদর সেখানে বসে আছে ঠিকই। তার পাশে একজন বসে আছে। তার নাম ন্যাড়া গুলগুলি। ওর রোগা ছোটখাটো চেহারা, কিন্তু দারুণ ছুরি চালায়, চোখের নিমেষে যে-কোনও লোকের পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারে। ওরা দু'জন যখন জাঁকিয়ে বসেছে, তখন নিশ্চয়ই বড় কোনও মতলব আছে।

রঘু সরদারের একবার লোভ হল দামোদরের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে। আট-দশজন লোক জুটিয়ে যদি একটা দল গড়া যায়, তা হলে ওই লম্বা নীল মানুষটা আর বাঁটকুল গুটুলিটাকে ভয় কী! ওদের কাছে তো ছুরি-বন্দুক নেই।

কিন্তু নীল মানুষের চেহারাটা মনে পড়তেই তার বুক কেঁপে উঠল। ও যদি ব্রহ্মদৈত্য হয়, তা হলে তো গুলি-গোলাও হজম করে ফেলবে! নীল মানুষটা একদিন গুটুলিকে কী যেন সব বলছিল, পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহের কথা। ও কি সেখান থেকে এসেছে নাকি? তা হলে বাংলায় কথা বলে কী করে?

দরকার নেই বাবা, এ তল্লাট থেকে একেবারে চম্পট দেওয়াই ভালো।

রঘু সরদার পেট্রল পাম্পটার কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এ রাস্তা দিয়ে বাস চলে না। কিন্তু অন্য কোনও গাড়ি পেট্রল পাম্পে থামলেই সে তাতে উঠে পড়বে।

আধঘণ্টা পরে একটা অ্যাম্বাসেডার গাড়ি এসে থামল। তাতে দু'জন মহিলা, দু'জন বাচ্চা আর দু'জন পুরুষমানুষ। রঘু সরদার বিরক্তিতে মুখটা কৌঁচকাল। এ গাড়িতে তাকে নেবে না।

দুটো ট্রাক ঝড়ের বেগে চলে গেল, থামলই না। আর-একটা গাড়ি থামল, তাতে শুধু ড্রাইভার আর পেছনের সিটে একজন মোটা মতন লোক। এবারে রঘু সরদার গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে কাঁচুমাচু মুখে বলল, ভাই, আমার খুব জরুরি দরকার, বাড়ি থেকে অসুখের খবর এসেছে, আমাকে সামনের শহরটাতে একটু পৌঁছে দেবে?

ড্রাইভার কিছু না বলে মালিকের দিকে তাকাল।

মালিক খেঁকিয়ে উঠে বলল, না না, ওসব হবে না, এখানে হবে না।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মালিক আবার বলতে লাগল, ডাকাতের মতন চেহারা, ওসব লোককে একদম বিশ্বাস নেই। রাস্তা থেকে অচেনা লোক কক্ষনও তুলবে না।

রঘু সরদার অস্থির হয়ে উঠল। মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার দেরি দেখে যদি

নীল মানুষ তার খোঁজে ধেয়ে আসে। তবে এ ক’দিনে একটা ব্যাপার সে বুঝেছে, সন্ধের আগে এ নীল মানুষটা জঙ্গল ছেড়ে বেরুতে চায় না।

এদিকে বিকেলের আলো পড়ে আসছে, সন্ধের আর দেরি নেই।

আরও আধ ঘণ্টা পরে একটা ট্রাক এসে থামতেই রঘু সরদার অনেক কাকুতি মিনতি করে তাতে উঠে পড়ল। ট্রাক ড্রাইভার বলল, দশ টাকা দিতে হবে। রঘু সরদারের কাছে টাকা না থাকলেও সে বলে উঠল, দেব, নিশ্চয়ই দেব। আগে আমাকে পৌঁছে দাও—।

মিনিট দশেক যেতে না যেতেই ট্রাকের গতি কমে এল। রঘু সরদার জিপ্তেস করল, কী হল, থামলে কেন ভাই? আমার যে খুব জরুরি দরকার।

ট্রাক ড্রাইভার উত্তর দিল, সামনে পথ বন্ধ।

রাস্তাটা সেখানে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে গেছে। একদিকে ঘন জঙ্গল, আর একদিকে খাদের মতন। চার-পাঁচখানা গাড়ি থেমে আছে সেখানে। এই সবক’টা গাড়িকেই রঘু সরদার আগে চলে আসতে দেখেছে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে জটলা করছে এক জায়গায়। সামনে রাস্তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সেটা না সরালে কোনও গাড়িই যেতে পারবে না। অত বড় পাথরটা সরানো যাবেই বা কী করে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাশের জঙ্গলে জোনাকি জ্বলেছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে চাঁদের আলো। জায়গাটা ভারী সুন্দর। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েও রঘু সরদারের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। কোনওরকমে একটা শহরে পৌঁছোতে পারলেই সে বেঁচে যেত। ব্রহ্মদৈত্যই হোক আর যাই হোক শহরে তাদের জরিজুরি খাটবে না।

পাথরটা সবাই মিলে ঠেলে সরানো যায় না?

এমন সময় পাশের জঙ্গল থেকে সরু গলায় একটা গান শোনা গেল, ‘কে বিদেশি মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজায় বনো।’

সে গান শুনেই রঘু সরদারের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম। সবাইকে ঠেলে সে দৌড় লাগালে সামনের দিকে। বড় পাথরের চাঁইটার ওপরে উঠে লাফিয়ে পার হতে যেতেই জঙ্গল থেকে একটা লম্বা হাত বেরিয়ে এল। তার কাঁধটা ধরে বেড়ালছানার মতন শূন্যে তুলে সেই হাতটা তাকে নিয়ে গেল। অন্য একটা হাত পাথরটাকে ঠেলে গড়িয়ে দিল পাশের খাদে।

এমন চোখের নিমেষে ঘটনাটা ঘটল যে, অন্য লোকেরা ভাবল, রঘু সরদারও বোধহয় পাথরটার সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে।

নীল মানুষ রঘু সরদারকে জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিল গুটুলির পায়ের কাছে। গুটুলি এখন মুখে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে অন্যরকম সেজে আছে। সে কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, রঘু, আমার পান কোথায়?

নীল মানুষ বলল, এটা তোমার কীরকম ব্যবহার বলো তো, রঘু সরদার? দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর পান খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, আর এখন সন্ধে হয়ে গেল, তবু তুমি পান নিয়ে এলে না। এখানে কী করছিলে?

রঘু সরদারের মুখে আর কথা নেই। সে বুঝতে পারল, তার শেষ নিশ্বাস ঘনিয়ে এসেছে।

গুটুলি আবার বলল, কী হল, আমার পান দাও।

রঘু সরদার এবারে বলে ফেলল, পানের দোকান বন্ধ ছিল। তাই আমি শহরে যাচ্ছিলুম পান আনতে।

তাই শুনে গুটুলি হি হি করে হেসে উঠল, আর নীল মানুষ হেসে উঠল হা হা করে।

তারপর নীল মানুষ বলল, এসো, একটা জিনিস দেখবে এসো!

আবার সে রঘু সরদারের কাঁধ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। গুটুলিকে তুলে নিল অন্য হাতে। অনেকখানি জঙ্গল পেরিয়ে এসে সে এক জায়গায় থেমে বলল, ওই দ্যাখো। দোকান-সমেত পানওয়ালাকে আমরা নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।

এখন অনেকটা জ্যোৎস্না উঠেছে, তাতে দেখা গেল দুটো গাছের সঙ্গে লতাপাতা দিয়ে বাঁধা রয়েছে দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। কাছেই পড়ে আছে একটা ছুরি।

পা দিয়ে সেই ছুরিটা ঠেলে দিয়ে নীল মানুষ বলল, এটা দিয়ে ওদের বাঁধন কেটে দাও। ছুরিটা কোথা থেকে এল জানো? ওই ন্যাড়াটা ওই ছুরি দিয়ে আমার পেট ফাঁসাতে এসেছিল। ভোঁতা ছুরি আমার পেটে ঢুকলই না।

ন্যাড়া গুলগুলি বলতে লাগল, ভূ-ভূ-ভূ-ভূ-ভূত।

আর তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসতে লাগল।

ছুরিটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রঘু সরদার। প্রায় এক বিঘত লম্বা ওই ছুরি দিয়ে মানুষের মুণ্ডু কেটে ফেলা যায় আর সেই ছুরি নীল মানুষের পেটে ঢোকেনি।

নীল মানুষ আবার বলল, ওদের বাঁধন খুলে দাও, আর পান সাজতে বলো।

রঘু সরদার ওদের বাঁধন কেটে দিতেই ন্যাড়া গুলগুলি ধপাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আর দামোদর কাঁপতে লাগল থরথর করে।

রঘু সরদার বলল, ওরে দামোদর, বাঁচতে চাস তো পান সেজে দে। ওরা যা বলছে কর!

পান সাজার জিনিসপত্তর সব এনে রাখা ছিল, দামোদর সেইরকম কাঁপতে কাঁপতেই দু'খিলি পান সাজল।

নীল মানুষ বলল, এক খিলি পানে আমার কী হবে? আমার একসঙ্গে দশটা পান চাই। শিগগির!

তখন আবার পান সাজা হল। তাড়াতাড়ির জন্য রঘু সরদারও সাহায্য করার জন্য হাত লাগাল।

দুই ডাকাতে মিলে পান সাজছে।

এই বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল গুলগুলি। নীল মানুষ বলল, এখন বেশ শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে, না?

একসঙ্গে দশটা পান মুখে পুরে নীল মানুষ একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলল। তারপর সে রঘু সরদারের দিকে ফিরে বলল, এবারে একটা ঘটনা শোনো! মনে করো, একজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ খুব নিরীহ, কারুর সাথেপাঁচে থাকে না, সে একটা দোকানে চাকরি করে। বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল তার। তারপর একজন দুষ্ট লোক সেই দোকানে ডাকাতি করার ষড়যন্ত্র করল। তারপর ডাকাতি করলও ঠিক, কিন্তু সব দোষ চাপিয়ে দিল ওই ছোটখাটো চেহারার নিরীহ লোকটির ওপর। তার ফলে সে মারধর খেল, তার চাকরিও চলে গেল। এখন এটা খুব অন্যায় কি না বলো? তুমি ডাকাতি করতে চাও, করো। কিন্তু একজন নিরীহ লোকের কাঁধে দোষ চাপাবে কেন? কী, এটা অন্যায় নয়?

রঘু সরদার বলল, হ্যাঁ, অন্যায়, খুব অন্যায়।

নীল মানুষ দামোদরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী বলো?

দামোদরও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা খুব অন্যায়। পরের ওপর দোষ চাপানো মোটেই উচিত নয়।

নীল মানুষ বলল, বাঃ, বাঃ, এই তো চাই। তোমাদের দু'জনেরই তো বেশ ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান আছে, দেখছি।

গুটলি এবারে এক টানে মুখের নকল দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে বলল, ওহে দামোদর, আমায় চিনতে পারো? আমিই রঘুনাথপুরের এক মুদিখানায় চাকরি করতুম, আর তুমি সেই দোকানে ডাকাতি করেছিলে!

দামোদর চোখ কপালে তুলে বলল, অঁ্যা? অঁ্যা? ওরে বাপ রে, আমার মহা অন্যায় হয়ে গেছে। আমায় তুমি মাপ করো বামুন ঠাকুর। তোমার পায়ে পড়ি।

গুটলি চোখ পাকিয়ে বলল, আমি বামুন ঠাকুর নই, আর তোমাকে মাপও করব না। অন্যায় করলে তার শাস্তি পেতে হয়, জানো না?

নীল মানুষ বলল, ওহে রঘু সরদার, তুমি আমাদের লোক। তোমার ওপরেই শাস্তির ভার দিলুম। ওকে কী শাস্তি দেওয়া যায়, বলো তো?

রঘু সরদার নীল মানুষকে খুশি করবার জন্য বলল, মাটিতে গর্ত করে ওকে বুক পর্যন্ত পুঁতে রাখা উচিত। আর ওই ন্যাড়া গুলগুলিটা আপনাকে ছুরি মারতে এসেছিল, ওকেও ওই শাস্তি দিতে হবে।

নীল মানুষ বলল, ওরে বাবা, এত কঠিন শাস্তি।

গুটুলি বলল, আর রঘু সরদার, তুমি যে কথার খেলাপ করে পালাবার চেষ্টা করেছিলে, তা হলে তোমার কী শাস্তি হবে? তুমি যাতে আর পালাতে না পারো, সেইজন্য তোমাকেও মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা উচিত। -

নীল মানুষ হা হা করে হেসে উঠল, তারপর বলল, তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক। ওরা তিনজনেই তিনজনকে শাস্তি দিক। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাথায় আটটা করে গাঁট্টা মারুক। নাও, রঘু সরদার তুমিই শুরু করো।

ন্যাড়া গুলগুলির এর মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে উবু হয়ে জুলজুল করে তাকিয়ে সব কথা শুনছিল। সে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত চাপা দিয়ে বলল, ওরে বাবা রে, আমার মাথা ন্যাড়া, গাঁট্টা মারলে আমার বেশি লাগবে! এটা অন্যায়!

নীল মানুষ বলল, ঠিক আছে, তা হলে গাঁট্টার বদলে থাপ্পড় চলুক।

ন্যাড়া গুলগুলি বলল, আমার গায়ে জোর কম। আমি জোরে থাপ্পড় মারতে পারব না, আমি চিমটি কাটব!

নীল মানুষ বলল, ঠিক আছে, তাই সই।

তারপর শুরু হল এক মজার ব্যাপার। এ ওকে থাপ্পড় মারে আর এ ওকে চিমটি কাটে। লেগে গেল চ্যাচামেচি ঝটাপটি। নীল মানুষ আর গুটুলি হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

খানিক বাদে যখন প্রায় রক্তারক্তি শুরু হবার উপক্রম, তখন নীল মানুষ হৈঁকে বলল, ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। নইলে কিন্তু এবারে আমি শুরু করব!

অমনি সব চুপ।

গুটুলি বলল, রঘু সরদার যে মাটি খোঁড়ার কথা বলছিল, সেটা কিন্তু মন্দ নয়। এই



জঙ্গলে বড় জলের কষ্ট। গ্রীষ্মকালে জঙ্গলের জন্তুজানোয়াররাও জলের কষ্ট পায়। ওরা তিনজন এখানকার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একটা পুকুর তৈরি করুক না। আমি খস্তা শাবল এনে দেব!

নীল মানুষ বলল, ভালো আইডিয়া। পুকুরটা পুরোপুরি খোঁড়া হয়ে গেলে আমি সেটার নাম রাখব রঘু দামোদর গুলগুলি।

দামোদর বলল, আমরা তিনজনে মিলে একটা পুকুর কাটব? তাতে যে এক বছর লেগে যাবে।

গুটুলি বলল, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তো অন্তত পাঁচ বছর জেল খাটতে। তার চেয়ে এখানে এক বছর তো বেশ সস্তায় হয়ে গেল! জেলখানার থেকে এখানে ভালো খাবার পাবে। তোমরা নিজেরাই তো রান্না করবে।

নীল মানুষ বলল, খাবারের কথায় মনে পড়ে গেল। বড্ড খিদে পেয়েছে যে? ও রঘু সরদার, আজ কী কী খাওয়াবে? যাও যাও, উনুনে আগুন দাও।

গুটুলি বলল, দামোদর পান সাজো।

ন্যাড়া গুলগুলি জিজ্ঞেস করল, আর আমি কী করব?

গুটুলি বলল, তুমি মাছ তরকারি কাটবে। তোমার তো ছুরির হাত ভালো।

নীল মানুষ হাসতে হাসতে বলল, আমাদের সংসারটা দিব্যি বড় হয়ে গেল, কী বলো!

নীল মানুষের মন খারাপ

গভীর জঙ্গল, এখানে মানুষ প্রায় আসেই না, দু’-একজন কাঠুরে বা শিকারি দৈবাৎ এসে পড়লেও ভূতের ভয়ে পালিয়ে যায়। লোকের মুখে মুখে রটে গেছে যে, ওই জঙ্গলে ভূত আছে। কেউ কেউ বলে, ভূত নয়, ব্রহ্মদৈত্য।

এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটা হাইওয়ে গেছে, সেখান দিয়ে ট্রাক যায়, অন্য গাড়ি যায়। কিন্তু কোনও গাড়ি কখনও থামে না এই জায়গায়। বিশেষত একটা পাহাড়ের গা দিয়ে যখন যেতে হয় তখন ড্রাইভাররা রামনাম জপ করে। ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে দিনে দুপুরেও একটা প্রকাণ্ড ভূতকে মুখ বাড়াতে নাকি দেখেছে কেউ কেউ।

সেই ভূত আসলে নীল মানুষ।

জঙ্গলের মধ্যে সংসার পেতে নীল মানুষ এমনিতে বেশ ভালোই আছে। তার ছোট্ট বন্ধু গুটুলি নানারকম মজার কথা বলে। রঘু দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি, এরা কুটনো কোটে, রান্না করে, বাসন মাজে, পা টিপে দেয়। ওই তিনজনকে দিয়ে গুটুলি আবার একটা পুকুরও কাটাচ্ছে। ওরা খন্তা শাবল নিয়ে রোজ সকালে কয়েক ঘণ্টা করে পুকুর খোঁড়ার কাজ করে, কাছে দাঁড়িয়ে গুটুলি খবরদারি করে ওদের ওপর।

রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি আগে ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। এখন তারা নীল মানুষের চেয়ে গুটুলিকেও কম ভয় পায় না। গুটুলির গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। এর মধ্যে ওরা পাঁচবার

পালাবার চেষ্টা করেছে। পাঁচবারই গুটুলির বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গেছে। প্রত্যেকবার ধরা পড়লেই ওদের শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যায়।

সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে, তবু এক-একদিন নীল মানুষ ছটফট করে ওঠে। মাটিতে চিতপাত হয়ে শুয়ে সে কান্না কান্না গলায় বলে, গুটুলি, ও গুটুলি! আমার কিছু ভালো লাগছে না।

গুটুলি ব্যস্ত হয়ে জিঞ্জেস করে, কেন, তোমার কী হল, নীল মানুষ? শরীর খারাপ লাগছে?

নীল মানুষ একটা ঝড়ের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, শরীর নয় মন! আমার তো কখনও শরীর খারাপ হয় না।

গুটুলি জিঞ্জেস করল, কেন তোমার মন খারাপ লাগছে? নতুন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?

নীল মানুষ বলল, ধুং! খাওয়ার কথা কে বলছে। দিনের পর দিন জঙ্গলে পড়ে থাকতে কারু ভালো লাগে?

গুটুলি বলল, আমার তো খুব ভালো লাগে। আমি এত বেঁটে বলে শহরে গেলেই লোকে আমাকে ঠাট্টা করে মাথায় চাঁটি মারে, আমার জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। তার চেয়ে এই জঙ্গলই বেশ ভালো।

নীল মানুষ বলল, বেঁটে বলে তোমায় দেখে সবাই ঠাট্টা করে আর এত লম্বা বলে আমায় দেখে সবাই ভয় পায়। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া শিখেছি। আমার ইচ্ছে করে শহরে গিয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে, গান শুনতে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে।

গুটুলি বলল, সে আর তুমি এজন্মে পারবে না। তুমি তো শুধু লম্বা নও, তুমি যে তালগাছ। তুমি এখনও রোজ রোজ লম্বা হচ্ছে। তোমায় আমি প্রথম যেরকম দেখেছিলুম, তার চেয়েও তুমি এখন বেশি লম্বা হয়ে গেছ। মাপলে বোধহয় দশ ফুটেরও বেশি হবে। তার ওপরে তোমার গায়ের রং একেবারে আকাশের মতন নীল, এমনকী তোমার জিভটা পর্যন্ত নীল! তোমায় দেখলে তো মানুষ ভয় পাবেই।



আমি যদি শহরে গিয়ে সবার সামনে হাত জোড় করে বলি, ওগো, যদিও আমার শরীরটা এত লম্বা আর গায়ের রংটা অন্যরকম, কিন্তু আমি তোমাদের মতনই সাধারণ মানুষ! আমি কারও ক্ষতি করতে চাই না!।

তোমার কথা শোনবার আগেই সবাই ভয়ে পালাবে। কিংবা শুনলেও বুঝতে পারবে না। তোমার গলার আওয়াজটা যে এখন জয়টাকের মতন হয়ে গেছে। আমিই শুধু বুঝতে পারি।

যদি ফিসফিস করে বলি? হাঁটু গেড়ে বসে সবার কাছে ক্ষমা চাই?

তা হলে ওরা তোমাকে বেঁধে চিড়িয়াখানায় ভরে দেবে!

কেন?

তোমাকে আর কেউ মানুষ বলে মানবে না! ভাববে, অন্য কোনও জন্তু!

নীল মানুষ পাশ ফিরে ছ ছ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, ওহো হো, কেন আমায় মানুষ বলে মানবে না? আমি মানুষ, মানুষ! ওহো হো, কতদিন ফুটবল খেলা দেখিনি। কতদিন ফুটবল খেলিনি! একসময় আমি ফুটবল খেলতে কী ভালোই না বাসতাম।

নীল মানুষের দু'চোখ দিয়ে কলের জলের মতন গলগল করে কান্না ঝরতে লাগল।

গুটুলি একটা গামছা দিয়ে তার চোখ মুছে দিতে দিতে বলল, আহা, কেঁদো না, কেঁদো না! লক্ষ্মী ছেলে, তোমার জন্য আমি ফুটবল এনে দেব। তুমি এইখানেই ফুটবল খেলবে!

নীল মানুষ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, কার সঙ্গে খেলব? একা-একা বুঝি ফুটবল খেলা যায়!

ওই রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি খেলবে তোমার সঙ্গে।

দূর দূর, ওরা তো ডাকাত, ওরা ফুটবল খেলার কী জানে?

একেবারে জন্ম থেকেই তো ডাকাতি শুরু করেনি। ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছে নিশ্চয়ই!

যারা ছোটবেলায় ফুটবল খেলে, তারা বড় হয়ে কখনও ডাকাত হয় না। ফুটবল খেললে মন ভালো হয়ে যায়।

ওদের ডেকে জিজ্ঞেসই করা যাক না, ওরা ফুটবল খেলা জানে কি না!

ডাকা হল রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে। ওরা জলকাদা মাখা হাত-পা নিয়ে লাইন করে দাঁড়াল সামনে।

নীল মানুষ শুয়েই আছে মাটিতে। গুটুলি একাট গাছের গুঁড়ির ওপর বসে জিজ্ঞেস করলে, অ্যাঁই, তোরা কেউ ফুটবল খেলা জানিস?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে গেল তিন ডাকাত। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। হ্যাঁ কিংবা না কোন উত্তরটা দিলে ভালো হবে, তাই-ই বুঝতে পারছে না।

ন্যাড়া গুলগুলি ফস করে বলে ফেলল, হ্যাঁ। আমি অনেক ফুটবল খেলেছি। এ গ্রামে ও গ্রামে খেলতে গেছি। কত গোল দিয়েছি!

গুটুলি চোখ পাকিয়ে বলল, তা হলে লোকের পেটে ছুরি মারতে শিখলি কখন?

ন্যাড়া গুলগুলি লজ্জা পেয়ে কান চুলকে বলল, সে আমাদের অন্য একজন গুরু শিখিয়েছিল। কিন্তু ফুটবল খেলা অনেক ভালোই জানি!

দামোদরই বা কম যাবে কেন। সে ঠোঁট উলটে বলল, ফুটবল মানে ওই গোল গোল বলে লাথি মারা তো? সে আমি অনেক লাথিয়েছি।

রঘু ওদের চেয়ে আর-একটু বড় ডাকাত। সে বলল, ওরা আর কী খেলেছে। আমি আমাদের গ্রামে খেলুড়ে দলের সর্দার ছিলাম। আমার দলকে খেলার জন্য কত জায়গা থেকে ডেকে নিয়ে যেত। সে অবশ্য গোঁপ দাড়ি ওঠবার আগের কথা।

গুটুলি বলল, আর গোঁপ দাড়ি গজাবার পর থেকেই বুঝি ডাকাতি শুরু করলি।

রঘু লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বলল, বারবার ওই কথা বলে লজ্জা দাও কেন, গুটুলি দাদা! সেসব তো এখন ছেড়ে দিয়েছি।

গুটুলি বলল, ছেড়ে দিয়েছিস, না, সুযোগ পাস না! যাক গে, যা, এখন পুকুর কাটতে যা। এই নিয়ে পরে আবার কথা হবে।

ওরা চলে যাবার পর গুটুলি নীল মানুষকে বলল, তা হলে দেখলে তো? ওরা তিনজনেই একসময় খেলেছে বলল। আমি আজই বল জোগাড় করছি। তুমি খেলার মাঠটা ঠিক করবে, চলো। ওঠো, ওঠো, ওরকম মন খারাপ করে শুয়ে থাকতে নেই।

পাহাড়ের একপাশে খানিকটা ঢালু জায়গা। প্রায় সমতলই বলা যায়, মাঝে মাঝে কয়েকটা ছোটখাটো গাছ রয়েছে। সেই জায়গাটা পছন্দ হল দু'জনেরই। নীল মানুষ পটপট করে গাছগুলো উপড়ে ফেলল। শুধু মাঠের দু'ধারে ছোট গাছ রইল। সেই দুটো হবে গোলপোস্ট!

গুটুলি বলল, আজ রাতেই আমি বল জোগাড় করে আনছি। কাল খেলা হবে। আজ ভালো করে খেয়ে দেয়ে ঘুমোও, মন খারাপ করে থেকো না। মন খারাপ থাকলে ভালো করে খেলা যায় না।

বিকেলের দিকে রঘু আর দামোদরকে নিয়ে গুটুলি চলে গেল শহরে।

যাবার পথে গুটুলি বলল, এই তোরা আবার যেন পালাবার চেষ্টা করিস না। তা হলে এবার কিস্তি ধরে এনে কান কেটে দেব!

দামোদর বলল, আরে ছি ছি, এখন পুকুর কাটা বন্ধ রেখে ফুটবল খেলতে বলছ, এখন কেউ পালায়? খেলাটা কত আমাদের জিনিস!

রঘু বলল, এক হিসেবে জঙ্গলে আটকে রেখে তুমি আমাদের উপকারই করেছ, গুটুলি দাদা। বছর খানেক এখানে থাকলে পুলিশ আমাদের কথা ভুলে যাবে। তখন নিশ্চিন্তে ফেরা যাবে, কী বলো?

জঙ্গল থেকে ওরা একটা হরিণ মেরে এনেছিল, শহরে এসে সেই মাংস বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া গেল, তাতে ফুটবল কেনা হল, আরও চা-বিস্কুট, নুন-মশলা, অন্য খাবারদাবার কেনা হল।

খেলা আরম্ভ হল পরের দিন সকালে। বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে, বেশি জোর হাওয়া নেই, ফুটবল খেলার পক্ষে বেশ ভালো দিন। একদিকে নীল মানুষ, আর একদিকে তিন ডাকাত। গুটুলি হল রেফারি। সে একটা হুইস্‌লও কিনে এনেছে।

ন্যাড়া গুলগুলি কিছুতেই সামনে আসতে চায় না, সে দামোদরের পেছনে লুকোচ্ছে। দামোদর তাকে বলছে, এই ঠেলছিস কেন, আমাকে ঠেলছিস কেন? রঘু বুক ফুলিয়ে বলল, তোরা সোজা দাঁড়া, আগে থেকেই ভয় পাচ্ছিস কেন?

মাঝখানে বলটা রেখে গুটুলি হুইস্‌ল বাজাতেই তিন ডাকাত পিছিয়ে গেল অনেকটা। তারা নীল মানুষের কাছাকাছি গিয়ে বলে পা ছোঁয়াতে সাহস পায়নি।

গুটুলি ধমক দিয়ে বলল, ও কী হচ্ছে! মন দিয়ে খেলবি সবাই।

নীল মানুষ বলে একটা শট লাগাল।

অমনি সেটা চোখের নিমেষে প্রায় উড়ে গেল পাহাড় পেরিয়ে।

তিন ডাকাত হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইল। নীল মানুষ বলল, যাঃ, ও কী হল? বলটা চলে গেল।

গুটুলি বলল, তাতে চিন্তার কিছু নেই। আমি আরও বল এনে রেখেছি। চিন্তার কিছু নেই। তবে, নীল মানুষ, একটু আস্তে খেলো। ফুটবল খেলাটা তো আর গায়ের জোরের ব্যাপার নয়। একটু আস্তে!

আর একটা বল সে রঘুদের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, এইবার তোমাদের দিক থেকে মারো!

রঘু বলল, দামোদর, তুই মারবি নাকি?

দামোদর বলল, ন্যাড়া গুলগুলিকে দাও। ও ভালো খেলে, বলেছিল।

ন্যাড়া গুলগুলি বলল, আমার বল ওই দৈত্যের গায়ে লাগলে যদি সে চটে যায়? ওসবের মধ্যে আমি নেই।

দামোদর রঘুকে বলল, ওস্তাদ, তুমি আমাদের সর্দার, প্রথম বলটা তুমিই মারো।

রঘু বলল, তোরা সব ভিতুর ডিম। দ্যাখ, আমি কেমন মারতে পারি। এটা হচ্ছে খেলা।

সাধারণ মানুষের তুলনায় রঘুর গায়ে বেশ জোর। সে কষে একটা ফ্রি কিক্ ঝাড়ল বলটাকে, সেটাও বেশ অনেক উঁচুতে উঠল।

নীল মানুষ খুশি হয়ে বলল, বাঃ বাঃ, এই তো চাই!

সে লাফিয়ে হেড করতে গেল বলটাকে। তার মাথায় লেগেই বলটা ফটাস করে ফেটে গেল।

নীল মানুষ বলল, ওই যাঃ, কী হল?

গুটুলি বলল, তাতে কিছু হয়নি, তাতে কিছু হয়নি। আরও বল আছে। কিন্তু তোমার আবার লাফিয়ে হেড করার কী দরকার ছিল, বলটা তো এমনিই এসে তোমার মাথায় লাগত!

আর একটা বল সে ছুড়ে দিয়ে বলল, এবারে একটু আস্তে মারো, নিচু করে মারো!

নীল মানুষ বলল, এবারে, খুব আস্তে, আলতো করে মারব। এই দ্যাখো।

বলটা সে নিচু করে মারল ঠিকই, সেটা এসে লাগল রঘুর পেটে, কিন্তু তাতে বলটা থামল না। রঘু বলটা সমেত উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল পেছনের গোলপোস্ট গাছটায়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিও মাটিতে শুয়ে পড়ে চ্যাচাতে লাগল, ওরে বাবা রে, আমরা আর খেলব না, আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা পুকুর কাটব, ফুটবল খেলতে পারব না। ওরে বাবা রে...

নীল মানুষ গুটুলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, এটা আমার গোল হয়েছে, না, হয়নি?

গুটুলি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, তুমি বড্ড ফাউল করো! আর খেলা হবে না। দেখি, রঘু বেচারার কী হল!

আর খেলা হবে না? আর খেলা হবে না— বলতে বলতে নীল মানুষ হাউহাউ করে কঁদে উঠল। তারপর মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, খেলা হল না, খেলা হল না আমার! কিছু ভালো লাগে না!

রঘুর মাথায় জল ঢেলে তার জ্ঞান ফেরানো হল। তারপর তিন ডাকাতই দৌড়ে খেলার মাঠ ছেড়ে পুকুর কাটতে চলে গেল স্বেচ্ছায়।

সেই থেকে নীল মানুষের আরও মন খারাপ হয়ে গেল। সে কিছু খেতেও চায় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। শুধু গাছতলায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে।

গুটুলি তিন ডাকাতকে ধমক দিয়ে বলল, ছি ছি ছি, তোরা কী বল তো! তোরা কি মানুষ! ছেলেটা একটু ফুটবল খেলতে চেয়েছিল, তোরা তাও খেলতে পারলি না? এই মুরোদ নিয়ে তোরা ডাকাত হয়েছিলি?

রঘু আর দামোদের লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল। ন্যাড়া গুলগুলি হাত জোড় করে বলল, দাদা, আর যা করতে বলো সব পারব, কিন্তু ওই খেলার কথা উচ্চারণ করো না। বাবা রে, এখনও আমার বুক কাঁপছে!

পরপর দু'দিন নীল মানুষ কিছু না খেয়ে রইল আর কাঁদল। গুটুলির কোনও কথাও সে শোনে না।

গুটুলি দেখল, এইরকমভাবে আর কয়েকদিন চললে তো মহাবিপদ হবে। না খেয়ে নীল মানুষ খুব দুর্বল হয়ে যাবে আর সেই সুযোগে রঘু-দামোদেরেরা যদি পালাবার চেষ্টা করে, তখন আর তাদের আটকানো যাবে না। এমনকী, ওরা তখন নীল মানুষকে মেরে ফেলারও ব্যবস্থা করতে পারে।

সে তখন নীল মানুষের কানের কাছে মুখ এনে বলল, তোমার নিজের খেলা তো হল না। কিন্তু তুমি ফুটবল খেলা দেখবে বলেছিলে, চলো আমরা শহরে ফুটবল খেলা দেখতে যাব! শহরে যাব!

নীল মানুষ বলল, আমি শহরে গেলে আর কেউ খেলবে! সবাই তো ভয়ে পালাবে!

গুটুলি বলল, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও! আমি যদি তোমায় ফুটবল খেলা দেখাতে না পারি, তা হলে আমার নামে তুমি কুকুর পুষো। আমি আর কোনওদিন তোমার কাছে মুখ দেখাতে আসব না! এখন ওঠো, উঠে চাটুি খেয়ে নাও তো, লক্ষ্মীটি!

নীল মানুষ তখন ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠল। নদীতে গিয়ে স্নান করল। তারপর দু’দিনের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে মেঘ-গর্জনের মতন একটা ঢেকুর তুলে বলল, আঃ! এবার দশ খিলি পান দাও তো।

তিন ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে পান সাজতে বসল।

কিন্তু কী করে যে নীল মানুষকে ফুটবল খেলা দেখানো হবে, তা আর গুটুলির মাথায় আসে না। যে-শহরটায় তারা জিনিসপত্রের কেনাকাটি করতে যায়, সেখানে মাঝে মাঝে ফুটবল খেলা হয় বটে। বাইরের টিমও খেলতে আসে। কিন্তু ফুটবল খেলা তো আর রান্তিরে হয় না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই শেষ হয়ে যায়। দিনের আলোয় নীল মানুষকে নিয়ে সেই শহরে যাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। নীল মানুষকে দেখলেই সবাই বাড়িঘর ছেড়ে পালাবে।

একদিন যায়, দু’দিন যায়, তিন দিন যায়। নীল মানুষ রোজই জিজ্ঞেস করে, কী গো গুটুলি, আমার ফুটবল খেলা দেখার কী হল?

গুটুলি হাত তুলে বলে, হবে, হবে, ঠিকই হবে, আমাকে একটু সময় দাও!

জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যে হাইওয়েটা গেছে, গুটুলি প্রায় সেই রাস্তাটার কাছে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসে থাকে। কতরকম গাড়ি যায়, সে লক্ষ করে। ট্রাক, মোটরগাড়ি, বাস। কতরকম মানুষ। কেউ এই জায়গাটায় থামে না।

একদিন সকালে একটা ট্রাকে করে একদল ছেলে যাচ্ছে, হঠাৎ তারা দেখল, রাস্তার মাঝখানে একটা বড় পাথরের চাঁই। ট্রাকটা আর যেতে পারবে না। ছেলের দল হইহই করে উঠল। গতকাল বিকেলে তারা এই পথ দিয়ে গেছে, তখন এরকম কোনও পাথর ছিল না। তারা ড্রাইভারকে বলল, ব্যাক করো। ব্যাক করো। গাড়ি ঘোরাও। এটা ভূতের জায়গা!

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে দেখল, পেছন দিকেও রাস্তায় এখন ওইরকম আর-একটা পাথর। সেদিকেও যাবার উপায় নেই।

ছেলেরা তখন ট্রাক থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে সবাই মিলে একটা পাথর ঠেলে সরাবার চেষ্টা করল।

তখন একটা হুইসল বেজে উঠল। রেফারির পোশাকে একটা ফুটবল বগলে নিয়ে গুটুলি হাজির হল সেখানে। এক হাত তুলে হাসিমুখে সে বলল, ওহে ছেলের দল, আজ তোমাদের এখানে নেমস্কন। তোমরা তো শহরে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলে, এবারে আমাদের টিমের সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলে যাও!

কয়েকটা ছেলে চৈচিয়ে উঠল, ভূত! ভূত! এই তো সেই ভূত!

আর কয়েকটা ছেলে বলল, দূর, এ তো একটা বেঁটে বাঁটকুল। এ ভূত হলেও একে আমরা পরোয়া করি না।

গুটুলি বলল, ভূতত্ব কিছু নেই। তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা ম্যাচ খেলবে। তারপর খাওয়াদাওয়া করবে। ফিরে এসে দেখবে রাস্তা পরিষ্কার! এসো, ভয় পাচ্ছ কেন?

ওই ছেলেদের যে ক্যাপ্টেন, সে বলল, খেলার ব্যাপারে আমাদের কেউ চ্যালেঞ্জ জানালে মোটেই ভয় পাই না। চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জি হলেও লড়ে যেতে রাজি আছি। তোমাদের কেমন টিম, বলো তো দেখি।

রাস্তা ছেড়ে ওরা ঢুকে এল বনের মধ্যে। গুটুলি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল খেলার মাঠে।

ক্যাপ্টেন বলল, কই, তোমাদের খেলোয়াড় কোথায়?

গুটুলি আর একটা হুইসল বাজাতেই বেরিয়ে এল রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। তারা পরেছে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। তারা মার্চ করে গিয়ে দাঁড়াল মাঠের এক দিকে।

এদিকের ক্যাপ্টেন অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, এই তোমাদের টিম! আর খেলোয়াড় কই?

গুটুলি বলল, আগে এই টিমকেই হারাও দেখি, তারপর আমার অন্য টিম বার করব!

ক্যাপ্টেন বলল, তুমি কে হে বাপু? এই জঙ্গলের মধ্যে শুধু শুধু আমাদের আটকিয়ে এখানে নিয়ে এলে? আমাদের ক্লাবের নাম ইলেভেন বুলেটস। আমরা এই জেলার চ্যাম্পিয়ন! এই তিনটে লোকের সঙ্গে আমরা কী খেলব? এ তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

ওদিক থেকে রঘু সর্দার বলল, ওহে, খুব যে বড় বড় কথা বলছ? খেলেই দেখো না, ক'টা গোল দিতে পারো!

ক্যাপ্টেন বলল, এগারো মিনিটে বাইশটা গোল দেব, দেখবে?

গুটুলি বলটা মাঠের মাঝখানে ছুড়ে দিতেই ক্যাপ্টেন একাই বলটা নিয়ে ড্রিবল করতে করতে, রঘু দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে তিনটে ল্যাং মেরে শুইয়ে দিয়ে ওপাশের গাছটার গায়ে বলটা ঠেকিয়ে বলল, এই নাও এক গোল!

অমনি কোথায় যেন ধূপ ধাপ ধূপ ধাপ শব্দ হল?

ক্যাপ্টেন চমকে উঠে বলল, ওকী? ও কীসের শব্দ!

গুটুলি বলল, ও কিছু না, ও কিছু না, আমাদের একজন সাপোর্টার হাততালি দিচ্ছে!

ক্যাপ্টেনের মুখখানা হাঁ হয়ে গেল, সে বলল, ওই আওয়াজ, ওই তোমাদের সাপোর্টারের হাততালি? কোথায় তোমাদের সেই সাপোর্টার?

গুটুলি বলল, ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। নাও নাও, আবার খেলা শুরু করো।

ক্যাপ্টেন ফিরে এসে আর একজনকে বলল, নে, এবার তুই গোল দিয়ে আয়!

দ্বিতীয় গোলটা অবশ্য তত সহজে হল না। দামোদর-রঘু-ন্যাড়া গুলগুলি যথেষ্ট ফাইট দিল, এমনকী ন্যাড়া গুলগুলি বলটা পায়ে নিয়ে এদের দিকে অনেকটা এগিয়েও এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ মেঘের ডাকের মতন বাঃ বাঃ শব্দ শুনেই সে এমন চমকে গেল যে বল বেরিয়ে গেল তার পা থেকে। এবারেও তারা গোল খেল।

এইরকমভাবে পরপর এগারোটা গোল খাবার পর এদিককার ক্যাপ্টেন বলল, গোল খেয়ে পেট ভরেছে, না, আরও চাও?

রঘু সর্দার বলল, আর চাই না। যথেষ্ট হয়েছে। কী বলো গুটুলিদা?

গুটুলি বলল, হ্যাঁ, এবারে তোমরা সরে যাও। এবারে আমাদের আর একজন খেলোয়াড় আসবে। তোমরা তার সঙ্গে একটু খেলে দ্যাখো তো বাপু!

গুটুলি আবার হুইস্‌ল বাজাতেই গাছপালার আড়াল থেকে এক লাফে এসে হাজির হল নীল মানুষ। তার মাপের তো কোনও প্যান্ট হয় না। তাই সে একটা ধুতি মালকৌঁচা মেরে পরেছে। আর খালি গা। সে এসেই হাত জোড় করে বলল, বেশি জোরে বল মারব না। খুব আস্তে আস্তে, কোনও ভয় নেই!

কিন্তু তার কথা কে শুনবে। ওদিককার এগারো জন খেলোয়াড়ই অজ্ঞান।

নীল মানুষ বলল, এ কী হল? আর খেলা হবে না? ওদের গোল শোধ দেওয়া হবে না?

গুটুলি এক ডজন ফুটবল নিয়ে এসে বলল, খেলা দেখার শখ ছিল, সে শখ তো মিটেছে? এই নাও, এবারে একটা একটা করে মারো, ওদের গোল শোধ করে দাও।

পরপর বারোখানা বলে কিক্‌ কষিয়ে ওপারে পাঠিয়ে নীল মানুষ হাসিমুখে বলল, শোধ দেবার পরেও একখানা বেশি!

গুটুলি বলল, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে তুমি রাস্তার ওপরের পাথর দুটো সরিয়ে দিয়ে এসো। আমি এই ছেলেগুলোর জলখাবারের ব্যবস্থা করি।

নীল মানুষ খুশি মনে লাফাতে লাফাতে চলে গেল রাস্তার দিকে।

নীল মানুষের পরাজয়

শেষরাতের দিকে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল হঠাৎ। শীতকাল, এ সময় এরকম বাদলা হওয়ার কথা নয়। রণজয় আর গুটুলির ঘুম ভেঙে গেল। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোটমতন গুহাকে ওরা বড় করে নিয়েছে, সেটাই এখন ওদের বাড়ি। রণজয় অন্য জায়গা থেকে একটা বড় পাথর এনে গুহার মুখটা আড়াল করে রেখেছে, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

ঝড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যাবার পর গুটুলি প্রথমে উঠে এসে বাইরে একটু উঁকি মারল। মড়মড় করে গাছ-ভাঙার শব্দ হচ্ছে, বাতাসেও একটা গৌঁ গৌঁ শব্দ। এরকম ঝড়-বৃষ্টি গুটুলি সাতজন্মে দেখেনি। সে ভয় পেয়ে ভেতরে ছুটে এসে রণজয়কে ডাকল।

রণজয়ের ঘুম ভেঙে গেলেও সে সহজে উঠতে চায় না। বেশ শীত পড়েছে, সে কস্মলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, বৃষ্টি পড়ছে, তাতে ভয়ের কী আছে? আমাদের গুহার মধ্যে তো আর জল ঢুকবে না!

গুটুলি বলল, কীরকম ভয়ংকর একটা শব্দ হচ্ছে। বাইরে এসে একবার শুনে দ্যাখো! মনে হচ্ছে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। যদি সারা পৃথিবী ভেসে যায়!

রণজয় তাক্সিলের সঙ্গে বলল, হেঃ, পৃথিবী ভাসলেই হল আর কী! এখন ঘুমোও। সকালে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এই সময় বাইরে যেন একসঙ্গে একশোটা কামান ফাটার শব্দ এল। গুটুলি রণজয়ের

হাত চেপে ধরে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, ও কী! ও কী? পাহাড় ভেঙে পড়ছে!

রণজয় হেসে বলল, এত ভয় কীসের, গুটুলিভায়া? বাজের আওয়াজ শোনানি কখনও?

এত জোরে বাজ পড়ে কখনও?

আমরা গুহার মধ্যে রয়েছি তো, তাই আওয়াজটা বেশি মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, চলো দেখি বাইরে। রঘু কোথায়?

রঘু কাঁদছে!

রণজয়কে এবারে উঠতেই হল। গুহাটা অনেকখানি লম্বা ভেতরে দু’তিনটে ঘরের মতন খোপ খোপ। তারই একটা খোপে ওদের রান্নাঘর, সেইখানেই থাকে রঘু। শীতের জন্য সেই ঘরটায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

রণজয় আর গুটুলি সেই ঘরে এসে দেখল, রঘু দেয়ালে পিঠ দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে আর বলছে, আজ শেষ হয়ে গেলুম! আজ আকাশ ভেঙে পড়বে, পাহাড় ভেঙে পড়বে, আর কোনওদিন বাড়ির লোকদের দেখতে পাব না গো!

রণজয় বলল, দেশের কী অবস্থা! ডাকাতগুলো পর্যন্ত এত ভিত্তি হয়? এই রঘু, চল, আমার সঙ্গে বাইরে চল, একটু বৃষ্টিতে ভিজে আসি!

এই সময় মেঝেটা একটু কেঁপে উঠল আর বাইরে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হল।

গুটুলি দারুণ ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে! মহাপ্রলয়!

রণজয় এবারে খুব দ্রুত গুটুলি আর রঘুকে দু’হাতে তুলে নিয়ে ছুটে চলে এল বাইরে। ভূমিকম্প হলে গুহার মধ্যে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক। বাইরে বৃষ্টি একেবারে চাবুকের মতন। একের পর এক গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে। কাছেই একটা ছোট পুকুর আছে, তার পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। রঘু আর গুটুলিকে দুটি বেড়ালছানার মতন দু’বগলে নিয়ে রণজয় ছুটল সেদিকে।

পুকুরটার ধারে পৌঁছোতেই হঠাৎ খুব জোরে একটা বিদ্যুৎ চমকে চতুর্দিক সাদা হয়ে

গেল। রণজয় মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করেও পারল না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রণজয়ের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ঝড়-বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই। দিনের আলো ফুটে গেছে। রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল। কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে? ভূমিকম্পে পৃথিবী চৌচির হয়নি, পাহাড়ও ভেঙে পড়েনি, তবু শুধু বিদ্যুৎ চমকে সে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? তার মাথায় কি বাজ পড়েছিল? মাথায় বাজ পড়লে কি কেউ বাঁচে?

রণজয় নিজের দু'গালে চড় মারল কয়েকটা। ব্যথা লাগছে তো। তা হলে সে মরেনি। গুলি আর রঘু তার দু'পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে রণজয় ছিটিয়ে দিল ওদের মুখে। একটু বাদেই ওদেরও জ্ঞান ফিরল।

রঘু চোখ মেলেই বলল, আমি কি মরে গেছি?

গুলি বলল, আমার কী হয়েছিল?

রণজয় বলল, ঝড়ে শুধু কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে, আর কিছুই হয়নি। সামান্য একটু মাটি কেঁপেছিল। রঘু, যা, উনুনে আগুন দে। চা আর রুটি বানা, আমার খিদে পেয়েছে!

রঘু আবার কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউভেউ করে।

রণজয় অবাক হয়ে বলল, আরে, এ ডাকাতটা দেখছি বাচ্চাদেরও অধম হয়ে গেছে। এই, তোর এখন আবার কান্নার কী হল?

রঘু বলল, আমি দোষ করেছি বটে, তা বলে কি কোনওদিন ছুটি পাব না?

গুলি বলল, কতগুলো ডাকাতি করেছিলি মনে নেই। তোকে যদি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতুম, তা হলে সারাজীবন জেলে পচতে হত!

রঘু বলল, রোজ রোজ রান্না করার চেয়ে জেলে থাকাও ভালো!

রণজয় ধমক দিয়ে বলল, যা, আগে চা-টা তৈরি কর। আমরা গুহায় আসছি একটু বাদে।



রঘু চলে যাবার পর গুটুলি বলল, ওস্তাদ দ্যাখো, আকাশ এখন একেবারে পরিষ্কার। গতকাল বিকেলেও এরকম পরিষ্কার ছিল। তবু রাত্তিরে ওরকম ঝড়-বৃষ্টি হল কী করে? আমরাই বা অজ্ঞান হয়ে গেলুম কেন?

রণজয় বলল, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে...

সে কথা শেষ করার আগেই পেছনে শোনা গেল মানুষের পায়ের শব্দ। ওরা পেছন ফিরতেই দেখল, দুটি কিশোরী মেয়ে পুকুরটার দিকে আসছে।

মেয়ে দুটিকে একেবারে হুবহু একরকম দেখতে। দু'জনেরই বয়েস হবে তেরো-চোদ্দো, মাথায় লম্বা চুল, একজন একটা লাল রঙের, অন্যজন একটা হলদে ফ্রক পরা। দু'জনেরই কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। দু'জনেরই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো।

ওরা যেমন মেয়ে দুটিকে দেখে অবাক হয়েছে, তেমনি মেয়ে দুটিও ওদের দেখে অবাক ভাবে থমকে দাঁড়াল। রণজয় প্রায় আট ফুট লম্বা, গায়ের রং আকাশের মতন নীল, আর গুটুলিকে দেখতে একটি বাচ্চা ছেলের মতন হলেও তার নাকের নীচে পুরুট্টু গোঁফ।

রণজয় আর গুটুলিকে দেখার পর মেয়ে দুটি একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

রণজয়ের গলার আওয়াজ বাজখাঁই ধরনের, নতুন লোকরা শুনলে চমকে যায়। তাই সে গুটুলির চোখের দিকে তাকিয়ে একটা ইঙ্গিত করলে।

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, এই, তোমরা কারা গো? এই বনে কী করে এলে?

হাসি থামিয়ে লাল রঙের ফ্রক পরা মেয়েটি তার ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার বার করে কানের কাছে এনে কী যেন শুনল। তারপর সেটা অন্য মেয়েটির হাতে দিয়ে সে বলল, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।

গুটুলি বলল, তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছ? কোথা থেকে এলে? কীসে করে এলে? তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে?

হলদে ফ্রক-পরা মেয়েটি এবার অন্য মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ও আমার সঙ্গে আছে, আমি ওর সঙ্গে আছি। আর কেউ নেই।

তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এলে কী করে! তোমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?

লাল ফ্রক এবার হলদে ফ্রকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের গাড়ি কি খারাপ হয়ে গেছে? কী জানি। আমরা বেড়াতে এসেছি।

এই জঙ্গলে তোমরা দুটি মেয়ে বেড়াতে এসেছ, সঙ্গে কেউ নেই, এ তো বড় আশ্চর্য কথা।

হলদে ফ্রক বলল, বেড়াতে আসা বুঝি আশ্চর্য কথা? তোমরা এখানে কী করছ, তোমরা বেড়াতে আসোনি?

রণজয় যতদূর সম্ভব আস্তে ফিসফিস করে গুটুলিকে বলল, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী জানিস, এই মেয়ে দুটো আমায় দেখে ভয় পেল না কেন? এই প্রথম দেখছি, কেউ আমায় দেখে ভয়ে কাঁপছে না। মেয়ে দুটো তো মনে হচ্ছে, ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে! আমাদের দেখে হাসতে শুরু করল?

গুটুলি বলল, খুব পাকা মেয়ে। একা-একা বেড়াতে এসেছে!

তারপর সে গলা তুলে ওদের বলল, না, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। আমরা এখানে থাকি!

হলদে ফ্রক ও লাল ফ্রক চোখাচোখি করল একবার, তারপর লাল ফ্রক বলল, তোমরা জঙ্গলে থাকো? তোমরা কি জন্তু?

এইবারে রণজয় প্রচণ্ড জোরে হুংকার দিয়ে বলল, অ্যাঁ, কী বললে? আমরা জন্তু?

রঘু ডাকাতের মতন লোকও প্রথমবার রণজয়ের এইরকম হুংকার শুনে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর তারা পুকুরের ধারে এসে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

গুটুলি রেগে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, এই খুকি, আমাদের জন্তু বললে যে? আবার হাসছ?

দুটি মেয়েই প্রত্যেকবার কথা বলার আগে নিজেরা চোখাচোখি করে কী যেন বলে নেয়। এবারে হলদে ফ্রক বলল, ভুল বলেছি বুঝি? তোমরা বললে কিনা তোমরা জঙ্গলে থাকো, তাই আমরা ভাবলাম, জঙ্গলে তো জন্তুরাই থাকে।

গুটুলি বলল, জঙ্গলে মানুষও থাকে। কিন্তু তোমাদের বয়েসি মেয়েরা জঙ্গলে একা-একা আসে না। এখানে অনেক রকম বিপদ হতে পারে।

লাল ফ্রক বলল, আমরা একলা আসিনি তো, দু'জনে এসেছি। এখানে কীরকম বিপদ হয়?

গুটুলি বলল, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকে, অনেক চোর-ডাকাতও লুকিয়ে থাকে জঙ্গলে।

হলদে ফ্রক বলল, তোমরাই বুঝি চোর-ডাকাত? তোমরা আমাদের বিপদে ফেলবে?

গুটুলি বলল, আচ্ছা মুশকিল তো, এই মেয়ে দুটো কিছু বোঝে না। আমরা চোর-ডাকাত হলে কি তোমাদের আগে থেকে সাবধান করে দিতুম?

রণজয় বলল, আহা রে, মেয়ে দুটি সত্যি বড় সরল। ওরা বেড়াতে এসেছে, খুশি মতন বেড়িয়ে নিক। আমরা ওদের পাহারা দেব।

মেয়ে দুটি আঁজলা করে পুকুর থেকে খানিকটা জল তুলে সেই জলের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর সেই জলে জিভ ঠেকাল।

গুটুলি চোঁচিয়ে বলল, ওই পুকুরের জল খেয়ো না। কাছেই একটা ঝরনা আছে, সেই ঝরনার জল ভালো।

ওরা সেই কথায় তেমন আমল দিল না। চুমুক দিয়ে জলটুকু খেয়ে নিয়ে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কী যেন বলল।

পুকুরের ধারে ছোট ছোট ঘাসফুল ফুটে আছে। ওদের একজন একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেও জিভ ঠেকাল। অন্যজন আর-একটা ফুল তুলে খেয়ে নিল উপ করে।

রণজয় বলল, আহা রে, ওরা বোধহয় রাস্তা হারিয়ে বনের মধ্যে চলে এসেছে। খুব খিদে পেয়েছে ওদের। এই গুটুলি, ওদের ডাকো না। ওরা আমাদের সঙ্গে জলখাবার খেতে পারে।

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, ওগো, ও মেয়ে। তোমাদের নাম কী?

লাল ফ্রকপরা মেয়েটি বলল, নাম? আমাদের নাম? হ্যাঁ, আমাদের একটা করে নাম আছে। আমার নাম রুমুনা আর ওর নাম বুমুনা। এইবার বলো তো, তোমাদের নাম কী?

গুটুলি বলল, আমাকে সবাই গুটুলি বলে ডাকে। আর এই যে আমার বন্ধুকে দেখছ, এর নাম রণজয়, কিন্তু ওকে সবাই বলে নীল মানুষ।

বুমুনা জিজ্ঞেস করল, তোমরা একজন এত ছোট, আর একজন এত বড় কেন?

এই সময় দূর থেকে রঘু চেষ্টা করে বলল, চা, চা রেডি! বাবুদের কি পুকুরপাড়ে চা দিতে হবে, না, এইখানে আসা হবে?

রণজয় বলল, রঘু, এইখানে চা আর খাবারটার নিয়ে আয়!

গুটুলি বলল, ওগো রুমুনা বুমুনা, তোমরা আমাদের সঙ্গে চা খাবে এসো!

রুমুনা বুমুনা পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল। তারপর রুমুনা বলল, না, আমরা এখন ওই দিকে বেড়াতে যাব!

তারা দু'জনে নেমে পড়ল পুকুরে। তারপর পাশাপাশি দুটি হাঁসের মতন নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গেল ওপারে। তারপর নেচে নেচে গা থেকে জল ঝরাতে লাগল।

পুকুরের ওইধারে একটা বনতুলসীর ঝোপ। মেয়ে দুটি সেখান থেকে টপাটপ ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল।

রণজয় বলল, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। ওরা কি মেয়ে, না প্রজাপতি?

গুটুলি চোখ গোল গোল করে বলল, ওরা জুতো পরে জলে নেমে গেল, জুতো পরে সাঁতার কাটল। এ কী গুন্ডা মেয়ে রে বাবা! ওরা আবার ফুল খায়!

রণজয় বলল, অনেকে কুমড়োফুল আর বকফুল ভাজা খায়। আমরা ওই ফুল খেয়ে দেখিনি, হয়তো ভালোই লাগবে!

এই সময় রঘু একটা থালায় করে চায়ের কাপ আর রুটি নিয়ে এল। থালাটা নামিয়ে রেখে সে গোমড়া মুখে জিঙ্গেস করল, তোমরা কি পাখির ডিমের ওমলেট খাবে?

গুটলি বলল, সে আবার কী? পাখির ডিমের ওমলেট মানে?

রঘু বলল, কালকের ঝড়ে অনেকগুলো গাছ ভেঙে পড়েছে তো। আমাদের গুহার সামনে ওরকম দুটো গাছে দেখলুম যে, বেশ কয়েকটা পাখির বাসা। তার থেকে আমি আট-দশটা ডিম কুড়িয়ে রেখেছি।

রণজয় বলল, ধুৎ! পাখির ডিম আবার কেউ খায় নাকি? ডিমগুলো যেখানে পেয়েছিস, সেখানে রেখে আয়। তবে একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। অনেকদিন মুরগির ডিম খাওয়া হয়নি। এই জঙ্গলে আমি কয়েকবার বনমুরগির ডাক শুনেছি। দেখতে হবে তো ওরা কোথায় ডিম পাড়ে।

গুটলি বলল, মেয়ে দুটো গেল কোথায়?

মেয়ে দুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। তারা ঢুকে পড়েছে পেছন দিকের জঙ্গলে।

গুটলি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, এটা কিন্তু বেশ চিন্তার বিষয়। এখান থেকে গাড়ির রাস্তা অন্তত দশ-বারো মাইল দূরে। সেখান থেকে মেয়ে দুটো কি এত সকালে হেঁটে চলে এল? কিংবা কাল রাত্তিরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওরা এই জঙ্গলেই কাটিয়েছে? ওদের সঙ্গে কোনও পুরুষমানুষ নেই কেন?

রঘু বলল, মেয়ে? কোথায় মেয়ে? তোমাদের ভয়ে এই জঙ্গলে ভূত-পেতনি ছাড়া আর কোনও মানুষ ঢুকবে না!

রণজয় বলল, রঘু, চাল আর ডাল আছে তো? দুপুরে ভালো করে খিচুড়ি বানা। বৃষ্টি পড়লেই আমার খিচুড়ির জন্য মন কেমন করে। গুটলি আর আমি ততক্ষণ দেখে আসি, মেয়ে দুটো কী করছে!

রঘু বলল, সত্যি দুটো মেয়ে এসেছে নাকি? আমি তাদের দেখতে যাব না? রান্না না হয় পরে হবে!

রণজয় আঙুল তুলে ধমক দিয়ে বলল, যা, নিজের কাজ কর গিয়ে!

গুটুলি বলল, রঘু, আবার যদি পালাবার চেষ্টা করিস, তা হলে এবার কিন্তু তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব!

রণজয় গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধের ওপর। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে পুকুরের ধার ঘুরে পেছন দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল।

একটু খুঁজতেই দেখতে পাওয়া গেল মেয়ে দুটিকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা ফাঁকা জায়গায় মুখোমুখি বসে আছে রুমুনা আর ঝুমুনা। তাদের মাঝখানে দুটো ছাই রঙের খরগোশ। মেয়ে দুটি হাততালি দিচ্ছে আর খরগোশ দুটো নাচছে।

গুটুলি বলল, বুনো খরগোশ ওদের কাছে পোষ মেনেছে, এ কী অদ্ভুত ব্যাপার?

রুমুনা গুনগুন করে একটা গান শুরু করল, ঝুমুনা তার ঝোলা থেকে একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে রণজয় বলল, তুই ওই দিকটায় দাঁড়া। খরগোশ দুটো ধরতে হবে। খিচুড়ির সঙ্গে খরগোশের রোস্ট খুব ভালো জমবে।

রণজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে গান থামিয়ে রুমুনা বলল, নীল মানুষ, এই জিনিস দুটোর নাম কী?

রণজয় বলল, জিনিস মানে? এ দুটো তো খরগোশ। তোমরা খরগোশ চেনো না? তোমরা কোন দেশের মেয়ে!

গুটুলি বলল, এরা আসলে মেয়ে কিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রণজয় বলল, ওগো রুমুনা, ঝুমুনা, আজ দুপুরে আমাদের গুহায় তোমাদের নেমস্তন্ন। খিচুড়ি আর খরগোশের রোস্ট।

খরগোশ দুটো নাচ থামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পালাচ্ছে না। রণজয় হাত বাড়িয়ে খরগোশ

দুটোকে ধরতে যেতেই রুমুনা বলল, এই, ওদের ধরবে না!

রণজয়ের হাত দুটো সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল। তার থেকেও শক্তিশালী যেন কেউ চেপে ধরল তার হাত। সে প্রচণ্ড চেষ্টা করেও তার হাত দুটো নামাতে পারল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণজয় বলল, এইবার বুঝেছি। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল... তোমরা দু'জন অন্য গ্রহ থেকে এসেছ, তাই না?

রুমুনা খরগোশ দুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, এই, যাঃ যাঃ। তোরা খেলতে যা!

খরগোশ দুটো এবার তিন লাফে পালিয়ে গেল পাশের ঝোপে।

রুমুনা বলল, আমরা তো অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। আমরা অনেক দূরে থাকি, রান্তিরবেলা তোমরা যে ছায়াপথ দেখতে পাও, সেইখানে। ছুটির সময় আমরা বেড়াতে যাই। আমরা দু'জনেই তো ফুল নিয়ে পড়াশুনো করি, তাই তোমাদের এখানে ফুল চেখে দেখতে এসেছি। তোমাদের এই ছোট্ট জায়গায় অনেক রকম ফুল ফোটে।

রুমুনা বলল, আমরা নিজের মনে বেড়াব, তোমরা তোমাদের কাজ করতে যাও না!

রণজয় বলল, কাল রান্তিরে একটা মহাকাশযান তোমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে, ঠিক কি না? সেইজন্যই হঠাৎ ওরকম ঝড়-বৃষ্টি আর ভূমিকম্প হল। বেশ বড় স্পেসশিপ মনে হচ্ছে। তোমরা সঙ্গে অদৃশ্য বডিগার্ড নিয়ে এসেছ বুঝি?

রুমুনা বলল, বডিগার্ড আবার কী? কেন, আমরা নিজেরা বুঝি বেড়াতে পারি না?

রণজয় বলল, আমার হাত দুটো কে চেপে ধরে আছে? ছেড়ে দিতে বলো!

মেয়ে দুটি একথা শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। খুব মিষ্টি তাদের হাসির শব্দ। ঝরনার কুলকুল শব্দের মতন।

রুমুনা বলল, তোমার হাত আবার কে ধরে থাকবে? আমরা তো কারওকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি হাত দুটো ওরকম উঁচু করে আছ কেন, নীচে নামাও!

রণজয়ের হাত দুটো আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে তাকাল গুটুলির দিকে। গুটুলির মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, ওস্তাদ, এই মেয়ে দুটোর চোখ

একেবারে সবুজ। ভেতরে যেন আলো জ্বলছে। এরা কি সত্যিকারের মেয়ে?

রণজয় বলল, সেটাও একটা কথা বটে। ওগো রুমুনা বুমুনা, তোমরা কি সত্যিকারের মেয়ে? নাকি তোমাদের চেহারা অন্যরকম, ইচ্ছে করে পৃথিবীর মেয়েদের রূপ ধরেছ?

রুমুনা বলল, আমরা আমাদের মতন, আমরা হঠাৎ পৃথিবীর মেয়ে সাজতে যাব কেন? তোমরা বাপু এখন যাও, আমাদের অনেক কাজ আছে। তোমাদের পৃথিবীর সবরকম ফুল আমাদের একটু একটু খেয়ে দেখতে হবে। ওই যে ওই বড় গাছটায় ফুল ফুটে আছে, ওগুলো কী ফুল?

রণজয় বলল, ও তো শালগাছের ফুল। অত উঁচু থেকে তোমরা পাড়বে কী করে? দাঁড়াও, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

রণজয় উঠে দাঁড়বার আগেই রুমুনা তরতর করে সেই গাছে উঠে গেল। ঠিক গাছ বেয়ে ওঠা নয়, জুতোপরা অবস্থাতেই সে যেন হেঁটে উঠে গেল গাছটার ডগায়। খানিকটা ফুল পেড়ে এনে নিজে একটু খেয়ে দেখল, বাকিটা দিল রুমুনাকে।

রণজয় বলল, হুঁ, বুঝলুম, মাধ্যাকর্ষণে তোমাদের আটকাতে পারে না। তা শোনো রুমুনা আর বুমুনা, এই পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মহাশূন্যের অন্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে এসেছি। আমি নীল মানুষের গ্রহে গেছি, অদৃশ্য মানুষদের গ্রহ দেখেছি, তারপর যেখানে মানুষকে রাঙ্কুসে গাছ আছে... তোমরা ঠিক কী উদ্দেশ্যে এসেছ বলো তো? শুধু ফুল খেতে? আমাদের পৃথিবীর কোনও ক্ষতি করতে আসোনি তো?

রুমুনা বলল, কী বিচ্ছিরি কথা! আমরা তোমাদের ক্ষতি করব কেন? আমরা বেড়াতে এসেছি, আজ রাত্তিরেই আবার ফিরে যাব।

বাঃ, তা হলে তো তোমরা আমাদের অতিথি। আজ দুপুরে খিচুড়ি খেতে চলো আমাদের সঙ্গে। আচ্ছা, আমি যে খরগোশ দুটো ধরার চেষ্টা করলুম, তোমরা বাধা দিলে কেন?

বলেছি তো, তোমরা আমাদের বিরক্ত করো না। আমাদের ইচ্ছে মতন বেড়াতে
দাও। তোমরা অন্য জায়গায় যাও।

আমাকে এরকম বকে বকে কথা বলছ? জানো, তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েরা
আমাকে দেখেই কত ভয় পায়!

যারা ভয় পায়, তুমি তাদের ভয় দেখাওগে! আমরা ভয় পেতে একদম ভালোবাসি
না।

গুটলি বলল, ওস্তাদ, চলো, কেটে পড়ি! ওদের চোখের দিকে তাকালেই আমার বুক
কাঁপে!

রণজয় বলল, সে কী রে, দুটো পুঁচকে মেয়েকে দেখে আমরা ভয় পেয়ে পালাব? তা
হলে দ্যাখ—

রণজয় দু'হাতে রুমুনা আর ঝুমুনাকে তুলে নিয়েই ছুড়ে দিল শূন্যে, তারপর তাদের
হাত-বদল করে আবার লুফে নিয়ে বলল, এবার? কেমন লাগল?

ঝুমুনা বলল, আমাদের মাটিতে নামিয়ে দাও!

ঝুমুনা মুচকি হেসে বলল, এটা আবার একটা খেলা নাকি? তোমরা অন্য একটা খেলা
দেখবে?

মাটিতে দাঁড়িয়ে ঝুমুনা এক আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গুটলি আর রণজয়কে শুধু ঘুরিয়ে দিল
একবার। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জন দুটো দু'সাইজের লাটুর মতন বনবন করে ঘুরতে লাগল।

রণজয় চঁচিয়ে বলল, থামাও, থামাও, আমাদের থামিয়ে দাও!

ঝুমুনা আর ঝুমুনা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে।

দূরে হঠাৎ অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কারা যেন এইদিকেই
আসছে।

ঝুমুনা ঝুমুনা এবার হাসি থামিয়ে উঠে বসল। ওদের মধ্যে একজন থামিয়ে দিল
রণজয় আর গুটলিকে।

রণজয় বলল, এবারে তোমাদের আর-একটা খেলা দেখাই?

হুড়মুড় করে গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে এল কয়েকজন পুলিশ। সবার হাতে বন্দুক। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে রঘু।

রঘু হাত তুলে বলল, ওই দেখুন স্যার, ওই সেই দৈত্যটা। খুব সাবধান, ওকে পালাতে দেবেন না। এই দৈত্যটাই এদিককার সব ডাকাতি করে। আর ওই যে বেঁটে বাঁটকুলটা, ওইটা মহাশয়তান। এদের চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখুন, স্যার।

রণজয়ের বিশাল চেহারা দেখে পুলিশদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শুধু ওদের মধ্যে যে ইন্সপেক্টর, সে রিভলভার উঁচিয়ে বলল, হ্যান্ডস আপ! দৈত্য কোথায়, এ তো একটা লম্বা লোক। গায়ে নীল রং মেখেছে। গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে এর চেয়েও লম্বা লোক আছে।

রঘু বলল, না, স্যার, ও সত্যি দৈত্য। ওর গায়ে গুলি লাগলেও বোধহয় মরবে না। ওই বেঁটে গুটুলিটাকে আগে ধরুন।

ইন্সপেক্টর বলল, এই মেয়ে দুটি কোথা থেকে এল?

রঘু বলল, দৈত্যটাই নিশ্চয়ই ওদের ধরে এনেছে, স্যার।

ইন্সপেক্টর রুমুনা আর রুমুনাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে, মা? তোমরা কোথা থেকে এসেছ?

রুমুনা মিষ্টি হেসে বলল, আমরা বেড়াতে এসেছি। তোমরা কে? তোমরা বুঝি চোর-ডাকাতি?

ইন্সপেক্টর শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর রণজয়কে বলল, চল, চল ব্যাটা?

একজন পুলিশ গুটুলির ঠিক মাথার কাছে বন্দুক তাক করে আছে। রণজয় বুঝতে পারল, সে একটু এগোবার চেষ্টা করলেই ওরা আগে গুটুলিকে গুলি করবে। বিশ্বাসঘাতক রঘু ওদের আগেই বলে দিয়েছে যে, সে গুটুলিকে কতটা ভালোবাসে।

সে রুমুনা আর রুমুনার দিকে তাকিয়ে বলল, ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তা হলে যাই? আর দেখা হল না!

ইম্পেক্টর বলল, এই মেয়ে দুটিকেও যেতে হবে থানায়। চলো তো মা, চলো, কোনও ভয় নেই। আমাদের সঙ্গে চলো।

রুমুনা বলল, না, আমরা যাব না। আমরা বেড়াতে এসেছি!

রণজয় বলল, তোমাদের যদি ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়, আমি তোমাদের বাঁচাব। দেখবে?

যে রুমুনা আর রুমুনাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে খুব উঁচুতে ছুড়ে দিয়ে বলল, যাও! তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাও।

রুমুনা আর রুমুনা ঠিক দুটো পাখির মতন উড়তে লাগল। বনের মাথায়। পুলিশরা হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইল। সেই সুযোগে রণজয় একজন পুলিশের বন্দুকটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই ইম্পেক্টরটি চালিয়ে দিল তার বুকে একটা গুলি! রণজয় বসে পড়ল মাটিতে।

রুমুনা আর রুমুনা ওপরে উড়তে উড়তে একজন আর-একজনকে বলল, ওই লম্বা লোকটা মোটে একটাই খেলা জানে। আয়, ওদের আমি অন্য একটা খেলা দেখাই।

রুমুনা বলল, পরে যে লোকগুলো এল, ওদের ঘুমিয়ে ফেললে কেমন হয়?

রুমুনা বলল, ওরা আমাদের জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিল, ওরা লোক ভালো না। ওরাই বোধহয় চোর-ডাকাত। ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিই?

রুমুনা আর রুমুনা উড়তে উড়তে একটা সুন্দর গান ধরল। ঠিক যেন বাঁশির মতন আওয়াজ বেরুল তাদের গলা দিয়ে। সেই গান শুনে এক-একজন পুলিশ ধুপধাপ করে পড়ে যেতে লাগল মাটিতে। সবাই অজ্ঞান। এমনকী, গাছের পাখিরাও ঘুমিয়ে পড়ল।

রুমুনা আর রুমুনা নীচে নেমে এসে রণজয় আর গুলির হাত ধরে আবার উড়ান দিল। বনের মাথা ছাড়িয়ে, অনেক অনেক ওপরে, প্রায় মেঘের কাছে চলে এল ওরা। রণজয়ের বুকে গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, কিন্তু তার প্রাণ আছে। রুমুনা

আঙুলে করে তার মুখের একটু থুতু রণজয়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই তার রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

চোখে ফুঁ দিয়ে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল বুমুনা। তারপর বলল, এবারে মেঘের পিঠে বসিয়ে দেব তোমাদের। ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে। এই খেলাটা তোমরা জানো?

রণজয় বলল, না, জানি না। লক্ষ্মী দুই মেয়ে, তোমাদের কাছে আমি হেরে গেছি। হেরে গিয়েও আনন্দ হচ্ছে।

রগজয়ের শহর-অভিযান

ঘুম থেকে উঠে একটা মস্ত হাই তুলে রগজয় বলল, ধুং, আর এই জঙ্গলে থাকতে ভালো লাগে না! দিনের পর দিন একই রকম সবকিছু একঘেয়ে হয়ে গেছে।

গুটুলি একটু দূরে বসে একটা ছুরি নিয়ে পেয়ারা গাছের ডাল কেটে কেটে একটা গুলতি বানাচ্ছিল। সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, জঙ্গল ছেড়ে কোথায় যাবে?

রগজয় বলল, শহরে গিয়ে সিনেমা দেখব, ফুটবল ম্যাচ দেখব। দোকানের চা আর শিঙাড়া খাব! ওঃ, কতদিন যে গরম গরম শিঙাড়া খাইনি।

গুটুলি বলল, তুমি তো শহরে যেতে পারবে না। আমি বরং গিয়ে তোমার জন্য শিঙাড়া এনে দিতে পারি। আর আমি সিনেমা দেখে এসে তোমাকে সেই গল্পটা শোনাতে পারি।

রগজয় চোখ বড় বড় করে বলল, তুই সিনেমা দেখবি আর আমি সেই গল্প শুনব? মারব এক গাঁট্টা! কেন, আমি শহরে যেতে পারব না কেন রে?

গুটুলি বলল, তুমি আট ফুট লম্বা মানুষ, আর তোমার গায়ের রং ফাউন্টেন পেনের কালির মতন নীল। তোমকে দেখলেই যে সবাই দৈত্য ভাববে!

রগজয় বলল, দৈত্য আবার কী? আজকালকার দিনে দৈত্য বলে কিছু আছে নাকি? মানুষ হঠাৎ বেশি লম্বা হয়ে যেতে পারে না? শহরে কি এমন কিছু নিয়ম করা আছে যে, এর বেশি লম্বা লোক সেখানে যেতে পারবে না?

গুটুলি বলল, তুমি শুধু শুধু আমাকে ধমকাচ্ছ কেন, ওস্তাদ? আমি কি কোনও শহরের মালিক? এর আগে তুমি আর আমি শহরে যাবার চেষ্টা করেছি, দু’-একবার লোকে ভয় পেয়ে পালিয়েছে, মনে নেই? শহরের লোকরা শুধু মাঝারি মাপের মানুষ পছন্দ করে। তুমি বেশি লম্বা বলে তোমাকে দেখে ভয় পায়, আর আমি খুব বেঁটে বলে আমার মাথায় সবাই চাঁটি মারে।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল এবার আমরা একটা বেশ বড় শহরে যাব। লোকে ভয় পেলে আমি তার কী করতে পারি। আমি তো ইচ্ছে করে কারুকে ভয় দেখাচ্ছি না, কারু কোনও ক্ষতিও করছি না।

গুটুলি তবু বলল, কী দরকার ঝামেলার মধ্যে গিয়ে! এই জঙ্গলে তো আমরা বেশ আছি।

রণজয় দু’হাত দিয়ে গুটুলিকে শূন্য তুলে প্রচণ্ড চিৎকার করে বলল, আমার ভালো লাগছে না। আমার ভালো লাগছে না। আমার কিছু ভালো লাগছে না!

সেই আওয়াজে গুটুলির কান ফেটে যাবার জোগাড়। সে দু’হাতে কান চেপে ধরল।

সন্ধে হয়ে এসেছে, একটু পরেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে। এরপর সারা রাত ধরে এখানে করার কিছুই থাকে না। রণজয় দিনের বেলা লম্বা ঘুম দিয়েছে, রাত্তিরে তার ঘুমও আসবে না।

রঘু নামে যে ডাকাতিটা ওদের রান্নাবান্না করে দিত, সে দিন সাতেক আগে পালিয়েছে। রঘুর যে গ্রামে বাড়ি, সেই গ্রামটা চেনে গুটুলি। ইচ্ছে করলেই তাকে আবার ধরে আনা যায়। কিন্তু রণজয় আর উৎসাহ বোধ করেনি। ধরে আনলেও সে আবার পালাবার চেষ্টা করবেই। ডাকাত কখনও রান্নাবান্নার কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

গুটুলিকে কাঁধের ওপর বসিয়ে রণজয় লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করল। শুকনো পাতার ওপর মচর মচর শব্দ হতে লাগল। রণজয়ের পায়ের আওয়াজ পেলে হিংস্র প্রাণীরাও ভয়ে দূরে সরে যায়। একদিন একটা চিতাবাঘ রণজয়ের সামনে এসে পড়েছিল,

তার পরেই সে কী জোর দৌড় লাগাল ল্যাজ গুটিয়ে! যেন একটা ভিত্তি নেড়ি কুকুর!

এই জঙ্গলের প্রায় মাঝখান দিয়েই একটা হাইওয়ে চলে গেছে। সেটা রণজয় চেনে। রাস্তার দিকেও সেই রাস্তা দিয়ে অনেক ট্রাক যায় নানারকম মালপত্র নিয়ে। একবার রণজয় সেইরকম একটা চলন্ত ট্রাক থেকে একটা বস্তা তুলে নিয়েছিল। সেই বস্তাটায় ভরতি ছিল আলু। রণজয় অনেকদিন আলুসেদ্ধ খায়নি। সেই বস্তাটা পেয়ে তার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। পরপর তিন-চার দিন আলুসেদ্ধ খাওয়া হল। তারপর আর একদিন রণজয় আর একটা বস্তা তুলে নিল, সেটাতে কিন্তু ছিল লোহালকড়! আর-একটা বস্তায় পেল সিমেন্ট! আলুর বস্তা আর পায়নি।

সেই রাস্তাটার কাছাকাছি এসে গুলি বলল, ওস্তাদ, শহর কত দূরে, তার তো কোনও ঠিক নেই। সারারাত ধরে হাঁটবে নাকি? পায়ে ব্যথা হয়ে যাবে না?

রণজয় বলল, হেঁটে না গেলে কে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে যাবে?

গুলি বলল, কোনও লরির ড্রাইভারকে অনুরোধ করলেই তো হয়। সব লরিই নিশ্চয়ই শহরে যায়।

রণজয় বলল, আমরা অনুরোধ করলেই শুনবে?

গুলি বলল, তুমি একটা লরি থামাও। আমি কথা বলব।

বড় রাস্তাটার পাশে একটা পাথরের আড়ালে ওরা দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। পরপর দুটো মারুতি আর ফিয়াট গাড়ি গেল, কিন্তু কোনও লরির দেখা নেই। যেদিন যেটা দরকার, সেটা কিছুতেই পাওয়া যাবে না। ছোট গাড়িতে বসতেই পারবে না রণজয়, তার বাস কিংবা লরি দরকার।

দু'ঘণ্টা দাঁড়াবার পর রণজয় যখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে, তখন দূরে দেখা গেল একজোড়া জোরালো হেডলাইট। হ্যাঁ, এবার একটা ট্রাক আসছে বটে।

ট্রাকটা ফাঁকা, পেছনে কোনও মালপত্র নেই, তাই আসছে খুব স্পিডে। রণজয় রেডি হয়ে রইল। কাছে আসতেই সে লম্বা হাত বাড়িয়ে পেছনটা চেপে ধরল।

কিন্তু সে ধরে রাখতে পারল না। হঠাৎ বাধা পেয়ে ট্রাকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, ইঞ্জিনে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হতে লাগল, আবার হুস করে বেরিয়ে গেল।

রণজয় আফশোসের সঙ্গে বলল, যাঃ!

ট্রাকের ড্রাইভারটি কিছু বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ট্রাকটার এইরকম ব্যবহারে চিন্তিত হয়ে সে একটু দূরে গিয়ে ব্রেক কষল। তারপর নেমে দেখতে এল চাকাগুলো।

ড্রাইভারটা টর্চ জ্বেলে নিচু হয়ে চাকা দেখছে, অক্লবয়েসি ক্রিনার ছেলেটিও তার সঙ্গে নেমেছে। রণজয় কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই, এত দেরি করলি কেন রে? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ক্রিনার ছেলেটি মুখ তুলে রণজয়ের সেই বিশাল মূর্তি দেখেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ভূ-ভূ-ভূ— বলতে বলতে মারল টেনে দৌড়। মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

ড্রাইভারটি সর্দারজি, সে এত সহজে ভয় পেল না, সে একলাফে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে কোমর থেকে টেনে বার করল কৃপাণ।

রণজয় বলল, আরে, এ যে দেখছি, ওই পুঁচকে একটা ছুরি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে চায়।

এবার গুলি রণজয়ের আড়াল থেকে সামনে এসে বলল, সর্দারজি, বাঁচে গা না মরে গা?

এবার সেই সর্দারজির চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। একবার সে প্রকাণ্ড চেহারার রণজয়কে দেখল, আবার দেখল একরঙা চেহারার গুলিকে।

গুলি বলল, ও সর্দারজি, তুমি লড়াই করলে মর জায়ে গা। আর লড়াই না করলে বাঁচে গা!

সর্দারজি তবু কৃপাণটা উঁচিয়ে ধরে রইল।

গুলি বলল, ছুরি খাপ মে রাখ দেও। হামলোগ ভূত না— মানুষ। তুমি আমাদের শহরে পৌঁছে দেবে?

সর্দারজি এবার কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, মানুষ?

রণজয় বলল, হ্যাঁ রে বাবা, মানুষ! একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছি, তাতে কী হয়েছে?
আমাদের কথা শুনে চলো, তা হলে তোমার কোনও ভয় নেই।

গুটুলি বলল, তোমার শাকরোটটি কোথায় ভয়ে পালাল? ডাকো তাকে।

রণজয় ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে পড়ে বলল, ওঃ, কতদিন পরে গাড়িতে চাপছি।
আমিও যে একসময় একটা ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে ছিলাম, তা ভুলেই যাচ্ছিলাম
প্রায়। একেবারে জংলি হয়ে গেছি।

গুটুলি আর সর্দারজি মিলে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল ক্লিনারটিকে। কিন্তু তার আর
পান্তাই পাওয়া গেল না।

এবার সর্দারজি উঠে বসে রণজয়কে আবার ভালো করে দেখল। হাত বাড়িয়ে
রণজয়ের গায়ে আঙুল ঘষল একবার। রং করা হয়নি, রণজয়ের গায়ের চামড়া সত্যিই
ঘন নীল। মুখখানা নীল।

ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, এইসা কায়সে ছয়া?

রণজয় বলল, সে অনেক লম্বা গল্প। তোমাকে চট করে বোঝানো যাবে না।

ড্রাইভারটি বলল, কুছ দাওয়াই থাকে ছয়া? হামকো দেও। আমার শরীরটাও তোমার
মতন করে দাও।

রণজয় হেসে বলল, ওরে গুটুলি, ও যে আমার মতন হতে চায়!

গুটুলি ড্রাইভারটির দাড়িওয়ালা থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, অত সোজা নয়, চাঁদু।
এবার গাড়ি স্টার্ট দাও তো!

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর রণজয় বলল, ওরে গুটুলি, এরকম একটা নেংটি
পরে শহরে যাব কী করে? শহরে সেজেগুজে যাওয়া উচিত, তাই না? আগে একটা
পোশাকের দোকানে যেতে হবে!

গুটুলি বলল, তোমার মাপের কোনও জামাপ্যান্ট কি কোনও দোকানে পাওয়া

যাবে? দরজি দিয়ে বানাতে হবে! আমার কোনও অসুবিধে নেই। যে-কোনও দোকানেই বাচ্চাদের পোশাক পাওয়া যায়। সাত-আট বছরের ছেলেদের জামা আমার গায়ে লেগে যায়।

রণজয় বলল, আমি দরজি দিয়ে জামাপ্যান্ট বানাব। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে জুতো বানাব। আমি মোটেই আর জংলি সেজে থাকতে পারব না।

গুটলি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, পয়সা কোথায় পাবে?

রণজয় বলল, ইচ্ছে করলেই তো আমি যে-কোনও ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি।

সর্দারজি চমকে উঠে বলল, ব্যাঙ্ক লুট? হাঁ-হাঁ, ইয়ে তো আচ্ছা বাত হয়। আগে একটা ব্যাঙ্কে নিয়ে যাব তোমাদের?

রণজয় বলল, না! ইচ্ছে করলে ব্যাঙ্ক লুট করতে পারি বলেছি, কিন্তু করব না। আমি টাকা রোজগার করব! শহরে কতরকম কাজ থাকে।

সর্দারজি বলল, হাঁ হাঁ, আমি আপনাদের কাজ দেব।

ট্রাকটা ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশ। আকাশে আজ চাঁদ নেই।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর রণজয় বলল, জানিস গুটলি, আমি মহাশূন্যে অনেকগুলো গ্রহ ঘুরেছি। কতরকম রকেট চালিয়েছি। অথচ আমি গাড়ি চালানো শিখিনি। আমি ইন্টার-গ্যালাকটিক মিসাইল চালাতে পেরেছি, আর এইরকম একটা ট্রাক চালাতে পারব না?

গুটলি বলল, চেষ্টা করে দেখো না। পারতেও পারো।

ঠিক বলেছিস তো। কখনও চেষ্টা করে দেখিনি। একবার চেষ্টা করতে দোষ কী?

সর্দারজিকে সরে বসতে বলো।

সর্দারজি ব্রেক কষো। আমি একবার চালিয়ে দেখব।

সর্দারজি প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চায় না। তখন রণজয় জোর করে সর্দারজির

পা দুটো তুলে দিল ওপরে। নিজেই ব্রেকে একটা লাথি কষাল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ট্রাক।

সর্দারজিকে পাঁজাকোলা করে তুলে পাশে সরিয়ে দিয়ে রণজয় নিজে বসল স্টিয়ারিং-এ।

তারপর বলল, দেখে নিয়েছি এটা সুইচ, এটা গিয়ার আর এটা অ্যাকসিলারেটর। আর ব্রেক তো সবাই চেনে। যে পাইলট প্লেন চালায় সে কি গাড়ি চালাতে পারবে না? জয় মা কালী! দেখা যাক কী হয়। সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিতেই ট্রাকটা হঠাৎ বিরাট জোরে ছুটতে শুরু করল।

সর্দারজি আতঁস্বরে চঁচিয়ে উঠল, রোকো! রোকো! রোকো! মর যায়গা!

রণজয় অ্যাকসিলারেটরের উপর পা আলগা করে বলল, প্রথমেই বেশি স্পিড হয়ে গেছে, এই তো? কমিয়ে দিচ্ছি! সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ব্যস! এবার ঠিক আছে? সত্যিই, এবার ট্রাকটা বেশ স্বাভাবিকভাবে চলছে।

গুটুলি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রণজয় বলল, গাড়ি চালানো তা হলে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। ব্যস, এবারে শহরে গিয়ে জামাকাপড় তৈরি করাব, কাজ করে টাকা রোজগার করব, সিনেমা দেখব, শিঙাড়া-কচুরি খাব, গাড়ি নিয়ে বেড়াব—

এরপর রণজয়ই ট্রাকটা চালাতে লাগল, সর্দারজি তাকে বলতে লাগল ডান দিকে না বাঁ দিকে যেতে হবে।

প্রায় রাত একটার সময় দেখা যেতে লাগল পাকা বাড়িঘর। অনেকটা শহরের মতন।

সর্দারজি বলল, এখানে থামবে। এখানে আমার ট্রাকে ডিজেল ভরে নিতে হবে। আমার চেনা একজনের পেট্রল পাম্প আছে। সেখানে ভালো খানাপিনা হবে।

রণজয় বলল, তা থামা যেতে পারে।

গুটুলি বলল, খিদেও পেয়েছে বেশ!



পেট্রল পাম্পের পাশে ট্রাকটা থামাবার পর সর্দারজি বলল, আপলোগ আগে বসুন। আমি পাম্পের মালিকের সঙ্গে বাতচিত্ত করে আসি। প্রথমেই আপনাকে দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।

রণজয় বলল, সেটা ভালো কথা!

সর্দারজি নেমে ভেতরে চলে গেল।

পেট্রল পাম্পের পেছনের দিকে একটা লম্বা গুদামের মতন বাড়ি। কাছাকাছি আরও কয়েকটা দোকান রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখন বন্ধ। চতুর্দিক নিঝুম।

একটু পরেই সর্দারজির সঙ্গে দু’-তিনজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। তাদের মধ্যে একজনের পেটমোটা পিপের মতন চেহারা। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, কোথায়? কোথায় রে দৈত্য?

সর্দারজি ট্রাকের দরজা খুলে বলল, নেমে আসুন বাবুজি!

রণজয় নেমে দাঁড়াতেই সবাই ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল। অন্যদের একজনের হাতে একটা রাইফেল, অন্য একজনের হাতে একটা শাবল।

রণজয় বলল, নমস্কার!

গুটলিও তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার।

পেটমোটা লোকটি বলল, ওরে বাবা! সত্যিই যে দেখছি দৈত্য! আট ফুট কী বললে সর্দারজি, তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে!

রণজয় যতদূর সম্ভব গলার আওয়াজ নরম করে বলল, আঙ্কে, আমার হাইট আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি। কিন্তু আমি দৈত্য নই। একটা বিশেষ কারণে আমার চেহারাটা বদলে গেছে। আমি লেখাপড়া জানি, ভদ্রঘরের সন্তান।

পেটমোটা লোকটি বলল, ঠিক মানুষের মতনই তো কথা বলে।

রণজয় আবার বলল, আমরা সত্যিই মানুষ! আমরা আপনাদের কোনও ক্ষতি করব না। এই আমার বন্ধু গুটলি, তার চেহারা ছোট হলেও বুদ্ধি ছোট নয়।

সর্দারজি বলল, ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন। খানা তৈরি। এই শেঠজি আপনাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন।

পেটমোটা শেঠজি বলল, হাঁ হাঁ, আসুন! খানা খেয়ে লিন।

এরপর রণজয় আর গুটুলির জন্য খাতির-যত্নের ধুম পড়ে গেল। লম্বা গোড়াউনের মতন বাড়িটা একটা সিনেমা হল। সেটারও মালিক ওই শেঠজি। তাঁর আরও অনেক ব্যাবসা আছে। একটা সার্কাস কোম্পানিও আছে তাঁর।

গরম গরম রুটি আর আলুর তরকারি খেতে দেওয়া হল ওদের। গুটুলি খেল তিনখানা রুটি, রণজয় পঁয়ষাট্টিটা রুটি শেষ করার পর বলল, আর পারছি না। পেট ভরে গেছে।

খেতে খেতে রণজয় ওদের কাছে নিজের গল্প শোনাল। কী করে অন্য গ্রহের প্রাণীরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কী করে শরীরটা এভাবে বদলে গেল।

রণজয় শহরে এসে থাকতে চায় শুনে শেঠজি বলল, আপনারা দু'জনে আমার এখানেই থাকুন। আমি চাকরি দেব। প্রত্যেকদিন পেট ভরে খাবার পাবেন।

রণজয় খুব খুশি হয়ে বলল, বাঃ, তবে তো খুব ভালো। আপনি যা কাজ বলবেন, সব করে দেব। আর রোজ রোজ সিনেমা দেখব। এখানে সিনেমা ক'টার সময় শুরু হয়?

শেঠজি বলল, সিনেমা দেখবেন? এখুনি চালিয়ে দিচ্ছি। শুধু আপনাদের দু'জনের জন্য। যত ইচ্ছে সিনেমা দেখুন না!

সত্যি সত্যি সেই রাঙিরেই সিনেমা চালু হয়ে গেল। দর্শক মাত্র দু'জন। হল অন্ধকার, পরদায় ফুটে উঠল একটা বিদেশি ছবি। বিকট গোরিলার মতন একটা প্রাণী জাপানের একটা শহর আক্রমণ করেছে। প্রথম থেকেই মারামারি।

রণজয় তবু লেখাপড়া শিখেছে। সে এইসব বিদেশি সিনেমাও একসময় দেখেছে কিছু কিছু। গুটুলি গ্রামের যাত্রা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি কখনও। সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতাই তার এই প্রথম।

সে প্রথম প্রথম দারুণ উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগল। সিনেমার পরদায় যখন আকাশের

একটা প্লেন ভেঙে পড়ছে, সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভয়ের চোটে।

কিন্তু বেশিক্ষণ তার উৎসাহ রইল না। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। রণজয় দু’-তিন বার ঠেলা দিয়ে তাকে জাগাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হল না। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না গুটুলি।

রণজয় একাই দেখতে লাগল সিনেমা। অনেকদিন পর সে সত্যিকারের আনন্দ পাচ্ছে।

রণজয় এমনই মন দিয়ে সিনেমা দেখছিল যে, পেছনে কোনও পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। হঠাৎ একটা মোটা শেকল এসে পড়ল তার বুকের ওপর। তারপর কেউ সেটা টেনে তার গলা বেঁধে ফেলল।

চার-পাঁচ জন লোক ঘিরে ধরল রণজয়কে।

পেটমোটা শেঠজি লাফাতে লাফাতে বলল, হাত বেঁধে ফেলো। পা বেঁধে ফেলো। পালাতে না পারে!

সরু গোঁফওয়ালা একজন লোক হাতে একটা রাইফেল নিয়ে বলল, এ তো গোরিলাদের চেয়েও অনেক লম্বা। ভালো খেলা দেখানো যাবে।

রণজয় দারুণ দুঃখের গলায় বলল, এ কী শেঠজি, আমাকে বাঁধলেন কেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?

শেঠজী বলল, ডেঞ্জারাস অ্যানিমালা। তোমাকে কি ছাড়া রাখা যায়!

রণজয় বলল, অ্যানিমালা? আমি মানুষ! আমি বললাম, আমি আপনার এখানে চাকরি করব। আপনি তখন রাজি হলেন।

শেঠজি বলল, চাকরি তো করবেই। তুমি আমার সার্কাসের দলে চাকরি করবে। তোমাকে খাঁচায় ভরে রাখব। হাজার হাজার লোক তোমাকে টিকিট কিনে দেখতে আসবে।

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি বলল, এ তো মানুষের মতন কথাও বলে। একে বেশি কিছু শেখাতেও হবে না!

রণজয় তার দিকে ফিরে বলল, আমি মানুষ, মানুষের মতন কথা বলব না? আমি লেখাপড়াও শিখেছি।

সরু গৌফওয়ালা লোকটি বলল, বা-বা-বা-বা! তা হলে তো আরও ভালো। ইংরেজি জানো?

শেঠজি বলল, আমাদের সার্কাস এবার কলকাতায় নিয়ে যাব। বিদেশে নিয়ে যাব। কথা-বলা দৈত্য, ইংরেজি-বলা দৈত্য, আর কেউ দেখাতে পারবে?

রণজয় গম্ভীরভাবে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন!

শেঠজি বলল, ছাড়া হবে না, তোমায় বেঁধে রাখতেই হবে। এত বড় একটা প্রাণীকে খাঁচায় না রাখলে পুলিশ আপত্তি করবে। তোমার তো কোনও অসুবিধে নেই, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে! পঞ্চাশখানা করে রুটি পাবে!

তারপর সে উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, আরে, সেই বাঁটকুলটা কোথায় গেল? ওকেও ধরো! ওকেও কাজে লাগানো হবে!

লোকগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে গুটুলির ঘুম ভেঙে গেছে। সে চেয়ারের তলায় লুকিয়ে পড়েছে।

গৌফওয়ালা লোকটা নিচু হয়ে দেখে বলল, ওই যে, ওই যে, ইঁদুরের মতন পালাচ্ছে!

শেঠজি বলল, ধরো, ধরো, ওকে ধরো!

রণজয় চৌঁচিয়ে বলল, গুটুলি, তুই পালা। ধরা দিবি না।

তিন-চারজন লোক মিলে তাড়া করে গেল গুটুলিকে। কিন্তু তাকে ধরা সহজ নয়। ইঁদুর-বেড়াল খেলার মতন গুটুলি এঁকে বেঁকে এদিক ওদিক ছুটে ওদের হাত এড়িয়ে পালাচ্ছে। এক-একবার তাকে দেখা যাচ্ছে না। আবার তাড়া খেয়ে সে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।

এরই মধ্যে কী করে যেন গুটুলি উঠে গেল স্টেজের ওপর। সিনেমাটা এখনও চলছে।

পরদার সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল গুটুলি। দু'জন লোক লাফিয়ে উঠে প্রায় তাকে ধরে ফেলল, গুটুলি তখন টিকটিকির মতন তরতর করে উঠে যেতে লাগল একটা থাম বেয়ে। আর চ্যাচাতে লাগল, আমি পুলিশ ডাকব। পুলিশ ডাকব!

সরু গোঁফওয়ালা লোকটি রাইফেল তুলে আচমকা একটা গুলি চালান সেদিকে।

প্রচণ্ড একটা শব্দ আর ধোঁয়া। গুটুলি ধূপ করে পড়ে গেল ওপর থেকে। আর নড়ল না।

শেঠজি ফ্যাকাশে গলায় বলল, মেরে ফেললে?

সরু গোঁফওয়ালা বলল, ওই বেঁটেটাকে নিয়ে এতক্ষণ সময় নষ্ট করে কী হবে? এই দৈত্যটাকে এক্ষুনি চালান করে দেওয়া দরকার। রণজয়ও উঠে দাঁড়িয়ে কান্না-মেশানো গলায় বলল, মেরে ফেললে? এবার আমি তোমাদের ছাড়ব না। তোমাদের আমি কোনও ক্ষতি করিনি। তবু তোমরা আমাকে মানুষের মতন বাঁচতে দিতে চাও না!

একটা জোরে ঝাঁকুনি দিতেই মটমট করে ছিঁড়ে গেল রণজয়ের হাতের শিকল। সে গলার শিকলটা হাত দিয়ে টানাটানি করতে লাগল।

সরু গোঁফওয়ালা লোকটা বলল, সাবধান! এদিকে এক পা এগোবে না। হাত দুটো মাথার ওপর তোলো!

রণজয় তার কথা গ্রাহ্য না করে খুলে ফেলল গলার শেকল। অন্য দু'জন লোক ডান্ডা তুলে মারতে গেল তাকে, রণজয় তাদের একজনকে শূন্যে তুলে মারল এক আছাড়!

তারপর সে সরু গোঁফওয়ালা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল!

সেই লোকটি বলল, মাথার ওপর হাত তোলো। নইলে তোমার বুকে গুলি করব। এক গুলিতে তুমি ছাতু হয়ে যাবে!

শেঠজি বলল, মেরো না, ওকে মেরো না! ওকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেক রোজগার হবে।

রণজয় সরু গোঁফওয়ালার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার বন্ধুকে মেরেছ। তোমাকে আমি শেষ করব!

সরু গৌফওয়ালা লোকটি ভয় পেয়ে দড়াম করে চালিয়ে দিল গুলি!

ধোঁয়া সরে যাবার পর দেখা গেল রণজয় এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে প্রচণ্ড রাগে।

শেঠজি আর দু’-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, গুলি লাগেনি!

রণজয় বলল, কোনও গুলি আমার শরীর ভেদ করতে পারে না।

তারপরেই যেন শুরু হয়ে গেল একটা প্রলয়কাণ্ড!

রণজয় এক-একটা চেয়ার তুলে ছুড়ে মারতে লাগল ওই লোকগুলোর দিকে। ওরা ভয়ের চোটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে করে পালাতে গিয়েও আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জড়াজড়ি করে। রণজয় প্রত্যেককে তুলে তুলে মাথা ঠুকে দিতে লাগল দেয়ালে।

তারা অজ্ঞান হয়ে গেলেও রণজয়ের রাগ কমল না। সে তবু ভাঙতে লাগল সব চেয়ার। সিনেমার পরদাটাও ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। তারপর গুলির কাছে গিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হায়, হায়, প্রিয় বন্ধু, তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে!

গুলি অমনি তড়াক করে উঠে বসে বলল, আমার গায়ে আসলে লাগেনি। আমি মটকা মেরে পড়ে ছিলাম।

রণজয় বলল, তুমি বেঁচে আছ! বাঁচালে আমাকে? তোমাকে ছাড়া আমি কী করে বাঁচতাম! কিন্তু এ কী হল! আমরা শহরে এলাম চাকরি করতে, আর এরা আমাকে খাঁচায় ভরে রাখতে চাইল?

গুলি বলল, শহর এরকমই! শহরে সবাই খাঁচার মধ্যেই থাকে। দেখছ না, বাড়িগুলোও কেমন খাঁচার মতন! চলো, আমরা জঙ্গলেই যাই।

দু’জনে বাইরে বেরুতেই দেখল, সেখানে বিরাট একটা ভিড় জমে গেছে!

সেই ট্রাকড্রাইভার সর্দারজি অনেক লোককে জোঁগাড় করেছে এর মধ্যে। রণজয়কে দেখেই সে বলে উঠল, পাকড়ো, পাকড়ো! পাকড়ো! গোরিলা! গোরিলা! দৈত্য!

রণজয় দু'হাত তুলে বললে, ভাইসব, ভয় নেই, আমি গোরিলাও না, দৈত্যও না।
আমি কারুর কোনও ক্ষতি করব না।

অনেকে একসঙ্গে ইট-পাথর ছুড়ে মারল তার দিকে।

রণজয় দু'-তিনবার একই কথা বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ যেন তার কথা বুঝতেই পারছে না। রণজয় যখন চেষ্টা করে কথা বলে, তখন মেঘের আওয়াজের মতন শোনায।

জনতা এমন চ্যাচামেচি করছে যে, রণজয়ের কথা কেউ শুনছেই না। কয়েকটা পাথরের টুকরো লাগল গুলির মাথায়। তার কপাল ফেটে রক্ত বেরতে লাগল।

তখন রাগে অন্ধ হয়ে রণজয় একটা লম্বা বাঁশ তুলে নিয়ে বলল, আজ সবাইকে শেষ করব।

গুলি বলল, শুধু শুধু মানুষ মেরে লাভ নেই, বন্ধু। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সে এক দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকটায়। রণজয়ও বাঁশ ফেলে এসে ড্রাইভারের সিটে বসল। সর্দারজি ছুটে এসে বলল, আরে, আরে, আমার ট্রাক নিয়ে ভাগছে! পাকড়ো, পাকড়ো!

রণজয় হাত বাড়িয়ে সর্দারজিকে এক ধাক্কা দিতেই সে ছিটকে পড়ে গেল অনেক দূরে।

ট্রাকটা এবার গর্জন করে বেরিয়ে গেল। কিছু লোক পেছন পেছন ছুটে এসেও ধরতে পারল না।

কিছুদূরে এসে ফাঁকা রাস্তায় পড়বার পর রণজয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গুলি বলল, দুঃখ কোরো না, বন্ধু। জঙ্গলই আমাদের ভালো।

রণজয় বলল, মানুষ কেন আমাদের দেখলেই মারতে আসে! শুধু চেহারার জন্যে?
আমরা কি কোনও দোষ করেছি?

গুটুলি বলল, দ্যাখো, জঙ্গলের পশুপাখি, গাছপালা, তারা আমাদের ভালোবাসে, নদীর জলে তোমার আর আমার মুখের ছায়া পড়লেও নদী তো রাগ করে না।

রণজয় বলল, তা বলে কি আর আমরা কোনওদিন মানুষের সঙ্গে মিশতে পারব না? চিরকাল জঙ্গলে নির্বাসনে থাকতে হবে?

গুটুলি চুপ করে গেল। দু'জনেরই মন খারাপ। সর্দারজির আর শেঠজির কথায় তারা খুব বিশ্বাস করেছিল। ওরা যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, গুটুলিরা একবারও ভাবতে পারেনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ করে গাড়ি চালাল রণজয়। সে যে কোন রাস্তায় যাচ্ছে, তা জানে না। যে-কোনও একটা দিকে গেলেই হল। কোথাও একটা গভীর বন দেখলে সেখানে থামবে।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। হঠাৎ রাস্তার ধারের একটা গ্রামের নাম লেখা বোর্ড দেখে রণজয় বলে উঠল, আরেঃ!

গুটুলি বলল, কী হল?

রণজয় বলল, গুটুলি, আমার আর এই দেশে থাকতেই ইচ্ছে করে না। এখানে একবার একটা জায়গায় যাব। যদি সেখানেও খারাপ ব্যবহার পাই, তা হলে আর কোনওদিন এদেশে ফিরব না।

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, এখানে কোন জায়গায়?

রণজয় বলল, এসেই না!

ট্রাকটা সে একটা ছোট রাস্তায় ঢোকাল। তারপর অনেকগুলো বাঁক ঘুরে সে এসে থামল একটা বাগানের ধারে।

ট্রাক থেকে নেমে রণজয় গুটুলির হাত ধরে নিয়ে এল একটা পুকুরপাড়ে। কাছেই একটা ছোট দোতলা বাড়ি, সামনে ছোট্ট উঠোন, তার মাঝখানে তুলসীমঞ্চ।

রণজয় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই বাড়িটার দিকে।

গুটুলি জিঞ্জেস করল, এটা কাদের বাড়ি?

রণজয় ধরা গলায় বলল, এই বাড়িতে আমি জন্মেছি। এখানে আমি বড় হয়েছি। এখান থেকেই অন্য গ্রহের মানুষরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কত কষ্ট করে আমি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আমার চেহারাটা বদলে গেছে, কেউ আমায় আর চিনতে পারেনি। সবাই আমাকে দেখে ভয় পায়। গ্রামের মানুষ আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আমার দাদা আমাকে চিনতে পারলেও বলেছিল, তুই এখান থেকে চলে যা, রণজয়। তুই দৈত্য হয়ে গেছিস। মানুষের মধ্যে তুই আর থাকতে পারবি না!

এই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা ছেলে। আট-ন'বছর বয়েস, ফুটফুটে চেহারা, হাতে একটা ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট।

রণজয় ফিসফিস করে বলল, আমার দাদার ছেলে, ওর নাম পিকলু।

গুটুলি জিঞ্জেস করল, ও তোমাকে চিনতে পারবে?

রণজয় কোনও উত্তর দেবার আগেই ছেলেটি দেখতে পেয়ে গেল তাকে। চোখ দুটো কপালে উঠে গেল। চিৎকার করতে গিয়েও মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ হল না। ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। ধপাস করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার আজও ফেরা হল না রে, গুটুলি! আমার প্রিয়জনেরাও আমাকে দেখে ভয় পায়! তুই পিকলুকে কোলে করে বাড়ির দরজায় রেখে আয়।

রণজয় বিষণ্ণ মনে আবার উলটোদিকে হাঁটতে লাগল।

আজব লড়াই

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে রণজয় দেখল, তার হাত দুটো যেন কী দিয়ে বাঁধা। অথচ দড়ি বা শিকলটিকল কিছু নেই। হাত দুটো ছড়াতে গিয়েই সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। যেন দুটো ব্লেন্ড তার হাতের চামড়া কেটে দিচ্ছে।

তার পা দুটোরও সেই অবস্থা। সে পা ফাঁক করতে পারছে না। কিন্তু কী দিয়ে যে পা বাঁধা, তাও বোঝা যাচ্ছে না। রণজয় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, তার পাশে গুটুলি নেই, কেউ নেই। মস্ত বড় একটা শিমুল গাছের তলায় সে আগে যেমন শুয়ে ছিল, সেইরকমভাবেই শুয়ে আছে।

অতিকষ্টে সে উঠে বসল। হাতদুটোকে মুখের কাছে এনে সে দেখল, একটা চুলের মতন সরু কোনও সুতো দিয়ে তার কবজিদুটো বাঁধা হয়েছে, কিন্তু চুল নয়, সেই সুতোটার রং নীল, তাই তার চামড়ার মধ্যে একবারে মিশে গেছে। রণজয় আর-একবার একটু টানবার চেষ্টা করেই বুঝল, এই সুতো ছেঁড়ার সাধ্য তার নেই। টানতে গেলেই তার হাতের চামড়া কেটে যাচ্ছে।

রণজয় যেই বুঝতে পারল যে, সে বন্দি, অমনি তার সারা গায়ে ঘাম এসে গেল। সাধারণ কোনও মানুষ তাকে বন্দি করতে পারে না, মোটা মোটা লোহার শিকলও রণজয় এক হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলেছে এর আগে। কিন্তু সে এই সরু সুতো ছিঁড়তে পারছে না? এত সরু আর এত শক্ত সুতো কি পৃথিবীতে পাওয়া যায়?



উঠে দাঁড়বারও ক্ষমতা নেই। রণজয় চিৎকার করে ডাকল, গুটুলি! গুটুলি!

কেউ সাড়া দিল না।

গুটুলি রণজয়ের প্রিয় বন্ধু, সে কখনও রণজয়কে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না। নিশ্চয়ই তাকেও কেউ বন্দি করে নিয়ে গেছে।

রণজয়ের দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠলেই তার খিদে পায়। আর বাচ্চা বয়েসের মতন বেশি খিদে পেলেই তার কান্না এসে যায়, যদিও তার চেহারাটা এখন রূপকথার দৈত্যের মতন।

হঠাৎ পাতার ওপর খসখস শব্দ হতেই রণজয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দু'জন মানুষ সমান তালে পা ফেলে হেঁটে আসছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তারা দু'জনে চ্যাংদোলা করে ধরে আছে একটা হরিণকে। হরিণটা বেঁচে আছে, ছটফট করছে। ওরকম একটা জ্যান্ত হরিণকে ধরে রাখা সহজ নয়, কিন্তু লোক দুটো যেন হরিণটার ছটফটানি গ্রাহ্যই করছে না।

লোক দুটির গায়ের রং নীল!

রণজয়ের সব রোম খাড়া হয়ে গেল। এদের সে চিনতে পেরেছে। এরা সপ্তম গ্রহ বলয়ের প্রাণী, এরা একবার রণজয়কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এরা আবার ফিরে এসেছে।

লোক দুটি রণজয়ের কাছে এল না, তার পেছন দিকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। একটু পরে সে দেখতে পেল একটি লোককে, তার এক হাতে একটা জ্যান্ত খরগোশ, অন্য হাতে একটা টিয়াপাখি। আশ্চর্য ব্যাপার, এরা জ্যান্ত হরিণ, খরগোশ, টিয়াপাখি ধরছে কী করে?

এই লোকটি রণজয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। এর মাথায় একটাও চুল নেই, মুখে দাড়িগোঁফ নেই। ভুরু নেই, চোখের পল্লবও নেই। সে কিড়মিড় করে কী যেন বলল।

রণজয় ওদের গ্রহে একবার ঘুরে এলেও ওদের ভাষা বোঝে না। ওদের দু'—একজনের

কাছে একটা যন্ত্র আছে, সেটা হাতে নিলে মনে মনে কথা বললেও বোঝা যায়।

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে অবশ্য বোঝা গেল, সে রণজয়কে তার সঙ্গে যেতে বলছে। কিন্তু রণজয় তো উঠে দাঁড়াতেই পারছে না।

লোকটি দু'বার ধমক দেবার পর রণজয়ের আরও কাছে এসে তার কোলের ওপর একটি পা দিয়ে দাঁড়াল। লোকটির পায়ের জুতো দেখলে মনে হয়, সিলের তৈরি, কিন্তু রবারের মতন নরম।

হাত খোলা থাকলে রণজয় একটা থাপ্পড় দিয়ে লোকটাকে শত হাত দূরে পাঠিয়ে দিতে পারত। এত সাহস যে, রণজয়ের গায়ে পা দেয়!

লোকটি রণজয়ের হাত-বাঁধা সুতোটার একটা দিক খুঁজে নিল। তারপর সেটা ধরে টানতেই রণজয় আবার ব্যথা পেয়ে চঁচিয়ে উঠল। লোকটি তা গ্রাহ্য না করেই সেই সুতোটা ধরে হিড়িহিড় করে টেনে নিয়ে চলল রণজয়কে। রণজয় মাটিতে গড়াতে লাগল, মাঝে মাঝে পাথর আর গাছের ডালপালায় তার সারা গা ছুড়ে গেল। কিন্তু বাধা দেবার কোনও উপায় নেই।

জঙ্গলটা যেখানে বেশ ঘন, সেখানে রয়েছে সেই গোল চকচকে একটা আকাশযান। এই রকেটটা রণজয় চেনে। ঠিক এইরকম রকেটে করেই নীল মানুষরা একবার তাকে নিয়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে। আবার তাকে সেখানে যেতে হবে? তা হলে আর কি কোনওদিন ফেরা যাবে?

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াতেই গোল রকেটের একটা গোল দরজা খুলে গেল। রণজয়ের মনে পড়ল, ওরা যে গ্রহে থাকে, সেখানে সবকিছুই গোল গোল।

দরজাটা খুলতেই লোকটা টিয়াপাখি আর খরগোশটাকে ছুড়ে ফেলে দিল ভেতরে। তারপর রণজয়ের দিকে তাকাল।

রণজয়ের হাতের চামড়া কেটে রক্ত পড়ছে। সে বুঝতে পারল, বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই, তাতে শুধু তার কষ্টই বাড়বে। সে নিজেই ঢুকে পড়ল রকেটটার মধ্যে।

ভেতরটা যেন একটা চিড়িয়াখানা।

সেখানে একটা করে গোরু, ঘোড়া, মোষ, হরিণ, নানা রকমের পাখি, একটা চিতাবাঘ, কয়েকটা সাপ, ব্যাং, ছাগল, প্রজাপতি, ফড়িং এইসব জন্তুজানোয়ার পোকা-মাকড়ে ভরতি।

একটা পাতলা ধোঁয়ায় ভরে আছে ভেতরটা, তাতে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। সেই ধোঁয়ার জন্যই বোধহয় জন্তুজানোয়ারগুলো সবাই এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, কেউ ছটফট করছে না।

এক কোণে বসে আছে গুটুলি। সে অজ্ঞান হয়ে যায়নি। কিন্তু রণজয়কে দেখেও কোনও কথা বলল না, শুধু তার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল।

যে লোকটি রণজয়কে টেনে এনেছিল, সে এবার রণজয়ের হাত ও পায়ের সুতোর বাঁধন খুলে দিল। তারপর ধমক দিয়ে কী যেন বলল।

রাগে রণজয়ের পিঙ্কি জ্বলে গেল। এই লোকগুলো পৃথিবী থেকে নানারকম জন্তুজানোয়ারের স্যাম্পেল নিয়ে যেতে এসেছে নিজেদের গ্রহে। তা বলে কি তারা মানুষও ধরে নিয়ে যাবে? পৃথিবীর মানুষকেও এরা জন্তু মনে করে?

এই লোকগুলো কেউই রণজয়ের মতন লম্বা নয়। কিন্তু রণজয় জানে যে, এদের মধ্যে কে যে রক্তমাংসের প্রাণী আর কে যে যন্ত্র-মানুষ, তা বোঝবার উপায় নেই। এই যন্ত্র-মানুষরাও একরকম নরম ধাতু দিয়ে তৈরি, তাই এদের হাত-পা মানুষের মতনই মনে হয়। কিন্তু এদের গায়ে অসম্ভব শক্তি।

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তার হাতে একটি ছোট্ট গোল রেডিয়ার মতন যন্ত্র। সেই যন্ত্রটা মুখের কাছে এনে সে কিছু বলল। রণজয় এবার পরিষ্কার বাংলায় শুনতে পেল, এই-যে পলাতক। আবার আমাদের দেখা হল, আমায় চিনতে পারো?

রণজয় মেয়েটাকে চিনতে পেরেছে। মহাকাশের বহুদূরে, সৌরলোক থেকে কোটি কোটি মাইল পেরিয়ে এদের নীল রঙের গ্রহে রণজয় একসময় বন্দি ছিল। সেই সময় এই

মেয়েটিই পাহারা দিত তাকে। ওদের গ্রহে ছেলেরা আর মেয়েরা সমান কাজ করে। এই মেয়েটির চোখে ধুলো দিয়েই রণজয় কোনওরকমে পালাতে পেরেছিল।

রণজয় বলল, আমাকে পলাতক বলছ কেন? আমি তো এই পৃথিবীরই মানুষ! তোমরা আমাকে বন্দি করেছিলে, আমি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছি।

মেয়েটি হেসে বললে, তুমি আর পৃথিবীর মানুষ নও। নিজের চেহারা কি তুমি দেখতে পাও না? তোমার গায়ের রং নীল! তুমি কত লম্বা! পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তোমার কোনও মিল নেই আর। তুমি আমাদেরই একজন হয়ে গেছ। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, আমাদের গ্রহে থাকবে। সেখানে তোমাকে কত আদরযত্ন করব।

রণজয় বলল, আমার চেহারাটা বদলে গেলেও আমার মনটা রয়ে গেছে মানুষের মতন। আমি এই পৃথিবীকেই ভালোবাসি। আমার দেশকে ভালোবাসি। এই পৃথিবীর গাছপালা, আলো-হাওয়া, জল সব আমার প্রিয়। তোমাদের ওখানে একটাও গাছ নেই। জল নেই। আমার ভালো লাগে না।

মেয়েটি বলল, কিন্তু তোমাদের এই পৃথিবীতে খাবার পাওয়া যায় না। এখনও কত মানুষ খেতে পায় না। এখানে একদিকে বিস্ত্রী গরম, আর একদিকে বিস্ত্রী ঠান্ডা। এই পৃথিবীটা মোটেই ভালো গ্রহ নয়। আমাদের ওখানে তুমি যখন যা খুশি চাও, খেতে পাবে। যে-কোনও আরাম চাও, সব পাবে। তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে আর কিছুদিন থাকলে আর কখনও এই বিচ্ছিরি পচা পৃথিবীতে ফিরতে চাইবে না।

রণজয় বলল, ভালো হোক খারাপ হোক, এই পৃথিবীতে আমি জন্মেছি। এই পৃথিবীই আমার প্রিয়। আমাকে কেন জোর করে নিয়ে যেতে চাইছ? আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না।

মেয়েটি এবার জোরে হেসে উঠে বলল, এবার আর তুমি ফিরে আসতে পারবে না। নীল মানুষ, এবার তোমার মনটা আমরা বদলে দেব। পৃথিবীর কথা তোমার আর মনেই পড়বে না।

একটা গৌঁ গৌঁ শব্দ শুনে রণজয় বুঝতে পারল এবার রকেটটা ছাড়বার উদ্যোগ করছে। আর বেশি সময় নেই। একবার পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করলেই এমন প্রচণ্ড গতি এসে যাবে যে, প্রায় চোখের নিমেষেই উড়ে যাবে মহাশূন্যে।

রণজয় মিনতি করে বলল, তোমরা সভ্য শিক্ষিত প্রাণী, তবু তোমরা ডাকাতি করতে আসো কেন? মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া অন্যায়, তা তোমরা বোঝো না?

মেয়েটি বলল, অন্যায়? সে আবার কী? এ কথাটার মানেই তো আমরা জানি না। আমাদের যখন যেটা ইচ্ছে হয়, তখন সেটা করি।

রণজয়ের পাশের লোকটি তার নিজের ভাষায় কী যেন বলে রণজয়ের হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে হাতটা ছেড়ে দিয়ে যেন ব্যথা পেয়ে উঃ করে উঠল।

রণজয়ের হাতটা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর ঘামে ভেজা। সেই হাতটা ধরেই লোকটা ছেড়ে দিয়েছে। রণজয়ের মনে পড়ে গেল, এরা কোনও তরল জিনিস সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ জলের মধ্যে পড়ে গেলেই এরা মরে যায়। প্রথমবার রণজয় যখন কেঁদে ফেলেছিল তখন তার চোখের জলের কয়েকটা ফোঁটায় ওদের একজনের হাত পুড়ে গিয়েছিল।

আর সময় নেই, আর সময় নেই। রকেটটা এঙ্কুনি উড়বে। রণজয়ের কাছে একটাই মাত্র অস্ত্র আছে।

সে ঘুরে দাঁড়িয়েই পাশের লোকটির গালে থুঃ করে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দেল।

লোকটি বিকটা একটা আর্তনাদ করে দমাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। সেই থুতু যেন তার গায়ে বুলেটের মতন লেগেছে।

ওদের দলনেত্রী ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সে তার নিজের ভাষায় অন্য লোক দুটিকে কী যেন আদেশ করল। সেই লোক দুটি রণজয়কে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই রণজয় এক লাফে চলে গেল দেয়ালের দিকে। মুখ সরু করে সে খুব জোরে দু'বার থুঃ

থুঃ করল। একটা ফসকে গেল, অন্য লোকটির গায়ে থুতু লাগতেই সে আগুনে পোড়া মানুষের মতন ছটফট করতে লাগল। বাকি লোকটি কোমরে হাত দিল একটা অস্ত্র তোলবার জন্য।

রণজয় মুখখানা ঝুঁকিয়ে ঠিক তার মুখের ওপর এক দলা থুতু ছুড়ে দিল। সেই লোকটি আকাশ ফাটানো চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওদের দলনেত্রী এবার কঠোর গলায় বলল, যথেষ্ট হয়েছে। ওহে পলাতক নীল মানুষ, তুমি এবার শাস্ত হবে, না এই মুহূর্তে তোমাকে শেষ করে দেব?

সেই মেয়েটির হাতে একটা ছোট্ট গোল মতন অস্ত্র। রণজয় জানে, ওর থেকে বলকে বলকে নীল আগুন বেরোয়। সেই নীল আগুন মানুষ তো দূরের কথা, ইস্পাত পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে।

রণজয়ের গলা শুকিয়ে গেছে। মুখে আর থুতু নেই থাকলেও অতদূরে তার থুতু পৌঁছোত না। আর কোনও উপায় নেই, এবার তাকে হার স্বীকার করতেই হবে। ওই গোল যন্ত্রটার সঙ্গে কোনও চালাকি চলে না।

মেয়েটি বলল, আস্তে আস্তে বসে পড়ো। দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাও। এবার তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলতে হবে দেখছি। তোমাকে ভালো কথা বললেও...

মেয়েটির কথা শেষ হল না, সে আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠল।

রণজয় দেখল, গুলি কখন চুপিচুপি মেয়েটির পেছন দিকে চলে গেছে। এবার সে লাফিয়ে উঠে পেছন থেকে মেয়েটির মুখখানা ধরে তার দুই কানের মধ্যে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মেয়েটি মেঝেতে পড়ে যেতেই রণজয় এক লাফে গিয়ে রকেটের দরজাটা খুলে ফেলল। রকেটটা সবেমাত্র মাটি ছাড়তে শুরু করেছে। রণজয় চিৎকার করে বলল, গুলি লাফিয়ে পড়! তারপর নিজেও সে ঝাঁপ দিল।

রণজয় আর গুলি দু'জনেই পড়ল একটা বড় গাছের ওপর। তারপর গড়াতে গড়াতে

ডালপালার মধ্যে দিয়ে খসে পড়ল মাটিতে। খুব বেশি তাদের লাগেনি।

গুটুলি বলল, ওস্তাদ, ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

রণজয় বলল, ওই রকেট একবার শূন্যে উঠে গেলে ফিরে আসতে সময় লাগে। তার আগেই আমরা পালাব। দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নিই। এখনও বুক ধড়ফড় করছে রে! এরকমভাবে যে বাঁচতে পারব, কল্পনাও করিনি!

গুটুলি থুঃ থুঃ করে নিজের হাতে দু'বার থুতু ছিটিয়ে বলল, ওস্তাদ, সত্যিই থুতুর এত শক্তি? কোনওদিন তো বুঝিনি!

রণজয় বলল, থুতু এমনি এমনি খরচ করিস না! ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগতে পারে।

ইচ্ছা গ্রন্থ

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই গাড়িটার দিকে তাকিয়ে গুটুলি বলল, ইস, কতদিন আইসক্রিম খাইনি!

রণজয় পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা গাছতলায়। সে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ তোর আইসক্রিমের কথা মনে পড়ল যে?

গুটুলি বলল, কী জানি! হঠাৎ আইসক্রিমের কথা ভেবে মনটা হু হু করে উঠল!

রণজয় বলল, এই জঙ্গলে তুই আইসক্রিম পাবি কোথায়?

গুটুলি বলল, আমরা কাছাকাছি যে গ্রামগুলোতে রান্তিরবেলা চুপিচুপি যাই, সেখানেও কেউ আইসক্রিম বানায় না।

রণজয় বলল, আইসক্রিম পাওয়া যায় শহরে। দূর দূর, আমি আর কিছুতেই কোনও শহরে যাব না!

গুটুলিও অবশ্য শহরে যেতে চায় না। শহরের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ওদের দু'জনেরই। রণজয় আট ফিট লম্বা, সাধারণ মানুষের প্রায় দেড় গুণ, আর গায়ের রংটা নীল। তাকে দেখলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৈত্য ভেবে ভয় পায়, আর বড়রা তাকে মারতে আসে। চেহারাটা বদলে গেলেও সে যে অন্যদের মতনই একজন মানুষ, তা কেউ বোঝে না। আর গুটুলি দারুণ বেঁটে। রণজয়ের কোমরের চেয়েও নীচে থাকে। তাকে দেখলে সবাই হাসে আর মাথায় চাঁটি মারে। অথচ অন্য মানুষদেরই মতন গুটুলিরও দুঃখ আছে, ভালোবাসা আছে।

চেহারা দিয়ে যে মানুষকে বিচার করা যায় না, তা বেশির ভাগ মানুষই আজও বোঝে না!

রণজয় জিজ্ঞেস করল, কী গাড়ি যাচ্ছে রে?

গুটুলি বলল, একটা বাস। তাতে কত মানুষ বসে আছে, বাসটা থামিয়ে ওদের একটু ভয় দেখাবে?

বাসটা থামানো রণজয়ের পক্ষে খুবই সহজ। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেই হল। কোনও গাড়িই তার অত বড় শরীরটাকে ধাক্কা মেরে সরাতে পারবে না। তা ছাড়া গাড়ির ড্রাইভাররা হঠাৎ তাকে দেখেই আঁতকে ওঠে। যারা ভূত-প্রেতে একদম বিশ্বাস করে না, তারাও ভাবে এই একটা সত্যিকারের ভূত!

রণজয় বলল, ওদের ভয় দেখিয়ে কী হবে!

গুটুলি বলল, তবু খানিকটা সময় কাটবে। খানিকটা হাসা যাবে। কিছুই যে করার নেই।

রণজয় বলল, ও খেলাটাও আর ভালো লাগে না। তুই আইসক্রিম খেতে চাইলি, তার একটা ব্যবস্থা করা যাক। এক কাজ করলে হয়। খানিকটা দুধ আর বরফ খেয়ে নিলেই তো পেটের মধ্যে গিয়ে আইসক্রিম হয়ে যাবে।

গুটুলি খানিকটা নাকি কান্নার সুরে বলল, নাঁ, আমি ওঁরকম চাই না, আঁসল আঁইসক্রিম খাব।

রণজয় বলল, তা হলে তো আইসক্রিম বানাতে হয়! দাঁড়া অঙ্ককার হোক!

রাত্রি গভীর হলে রণজয় গুটুলিকে কাঁধে নিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে চুপিচুপি একটা গ্রামে ঢুকল। সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে। শুধু দু’-চারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল রণজয়কে দেখে। রণজয় একবার ঘুরে দাঁড়াতেই কুকুরগুলো ভয়ে ল্যাজ তুলে পালাল।

এ গ্রামের একটা মিষ্টির দোকান ওরা আগে থেকেই চেনে। মাঝে মাঝে ওরা এরকম রাস্তিরে এসে এই দোকান থেকে চুরি করে মিষ্টি খেয়ে যায়। ঠিক চুরি নয়, তার বদলে

ওরা জঙ্গল থেকে অনেক আম, কাঁঠাল ও নানারকম ফল রেখে যায় এখানে। আজ এনেছে দু'ছড়া কলা।

প্রথমে ওরা দু'জনে টপাটপ করে কিছু রসগোল্লা আর সন্দেশ খেয়ে নিল। জঙ্গলে শুধু পাখির মাংস আর খরগোশের মাংস আর ফলমূল খেতে খেতে ওদের একঘেয়ে লাগে। একটা ডাকাতকে ওরা রাঁধুনি হিসেবে রেখেছিল, সে পালিয়েছে।

মিষ্টি খেয়ে পেট ভরাবার পর রণজয় বলল, ওই দেখ, একটা কড়াই ভরতি দুধ জাল দেওয়া আছে।

গুটুলি বলল, না, আমি দুধ খাব না!

রণজয় বলল, তোকে দুধ খেতে হবে না। কী করে এর খানিকটা দুধ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, দেখ তো! কিছু পাত্রটাত্র আছে?

গুটুলি বলল, একটা ডেকচি আছে, দেখছি। ঢাকনাও আছে।

রণজয় বলল, ডেকচিতে দুধ ভরে ভালো করে মুখটা বেঁধে নে। ছলকে যেন না পড়ে।

রণজয় নিজেই এক ঠোঙা চিনি আর একটা দেশলাইও খুঁজে নিল। তারপর বলল, চল গুটুলি, আমি আইসক্রিম বানাব!

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, বরফ কোথায় পাবে?

রণজয় বলল, পৃথিবীতে কি বরফের অভাব আছে? কত পাহাড়—!

যে জঙ্গলে ওরা থাকে, তার পেছনে পাহাড় আছে বটে, কিন্তু সেখানে বরফ নেই। বরফের টুপি-পরা পাহাড় অনেক দূরে।

গুটুলিকে কাঁধে নিয়ে রণজয় একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে যেতে লাগল। ওদের তো আর কোনও কাজ নেই। এখন আইসক্রিম বানাবার ঝোঁকটা পেয়ে বসেছে।

বরফের পাহাড়ে পৌঁছোল পরদিন সন্ধ্যাবেলা।

কোথাও কোনও জনমনুষ্য নেই, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে জমে আছে বরফ। শীতকাল,

তাই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দরকার নেই, অনেক নীচেই বরফ রয়েছে।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রণজয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল।

গুটুলি বলল, দোকানটা থেকে আমি একতাল ছানাও নিয়ে এসেছি। এই নাও দাদা, ছানা খেয়ে গায়ে একটু জোর করে নাও !

রণজয় বলল, তুই খা। ছানা খেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি আইসক্রিম বানিয়ে তবে খাব।

কী করে আইসক্রিম বানাতে হয়, জানো?

খুব সোজা। দুধটা ফুটিয়ে স্কীরের মতন করতে হবে, তার মধ্যে চিনি আর বরফ মেশালেই দেখবি চমৎকার আইসক্রিম হয়ে যাবে। কুলপিমালাইও হতে পারে। যা চাইবি!

দুটো সমান সাইজের পাথর জোগাড় করে উনুন বানাল রণজয়। গুটুলি কিছু শুকনো কাঠকুটো এনে গুঁজে দিল তাতে। আগুন জ্বালিয়ে ডেকচিটা চাপানো হল।

কাঠগুলো ভিজে, তাই আগুন নিভে যাচ্ছে বারবার।

গুটুলি মাটিতে শুয়ে পড়ে ফুঁ দিয়ে আবার আগুন ধরাচ্ছে। রণজয় চেয়ে আছে সামনের দিকে। হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

কাছেই খোলা জায়গায় জমে আছে চাপ-চাপ বরফ। একটু একটু জ্যোৎস্না পড়েছে তার ওপর। চাঁই-চাঁই বরফ যেন আপনা-আপনি শূন্যে উঠে যাচ্ছে। এ আবার কী ব্যাপার?

রণজয় ভালো করে লক্ষ করল।

এবার দেখতে পেল, একটা মস্ত বড় লোহার হাত যেন মুঠো মুঠো করে সেই বরফ তুলে নিচ্ছে।

অন্য যে কেউ এ দৃশ্য দেখলে ভয় পেত। কিন্তু রণজয়ের ভয়ডর নেই। সে বলল, গুটুলি, তুই দুধটা জ্বাল দে, আমি একটু আসছি।

রণজয় আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

তার চোখের ভুল নয়, সত্যিই একটা প্রকাণ্ড লোহার হাত বরফ তুলে নিয়ে যাচ্ছে পেছন দিকে।

রণজয় বুঝতে পারল, এটা একটা রোবটের হাত। হাতটা যদি এত বড় হয়, তা হলে রোবটটা কত বড়!

রণজয় আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। রোবটটাকে দেখতে পেল না, আবছা আলোয় তার চোখে পড়ল, খানিকটা সমতল জায়গার ওপর রয়েছে একটা গোলমতন রকেট। সেই রকেটের ভেতর থেকে লোহার হাতটা বেরিয়ে এসে বরফ তুলছে, তুলে ফেলে দিচ্ছে রকেটের মধ্যে।

বাইরে থেকে কারা যেন বরফ চুরি করতে এসেছে।

কোনও মানুষ বা অন্য ধরনের প্রাণীদের দেখা যাচ্ছে না, শুধু যেন রকেটের কাছাকাছি কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। বেশ বড় ধরনের জোনাকি!

গুটুলি একা থাকতে ভয় পায়। বরফ তোলার শব্দ শুনে সেও ছুটে এল রণজয়ের কাছে। ব্যাপারটা দেখে সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, দাদা, এটা কী হচ্ছে?

রণজয় বলল, রাস্তার অন্ধকারে পৃথিবীতে কত কী যে ঘটে যায়, মানুষ টেরও পায় না। বুঝতে পারছিস না, অন্য গ্রহের প্রাণীরা এসে আমাদের বরফ নিয়ে যাচ্ছে। এইরকমভাবে বোধহয় গাছপালা, নদীও নিয়ে যায়। আজকাল প্রায়ই শুনিস না, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে, নদী মরে যাচ্ছে, সেসব এদেরই কীর্তি!

গুটুলি বলল, দাদা, পালিয়ে চলো। অত বড় লোহার হাত!

রণজয় বলল, ভয়ের কী আছে, এই চুরি আটকাতে হবে না?

রণজয় তার বজ্রের মতন গম্ভীর গলায় হংকার দিল, এই, কে রে? কে বরফ চুরি করে?

সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহার হাত এদিকে ঘুরে এল। একসঙ্গে রণজয় আর গুটুলিকে মুঠোয় ভরে তুলে নিল শূন্যে। রণজয়ের শরীরে অসীম শক্তি, তবু সে ছাড়াতে পারল না নিজেকে। লোহার হাতটা ওদের ছুড়ে দিল রকেটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফেরার পর রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল। সে শুয়ে ছিল খোলা আকাশের নীচে। গুটুলি ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। ঠিক রোদ্দুরও নয়, ছায়াও নয়, একটা আবছা-মতন আলো রয়েছে চারদিকে। আকাশের রং কালো। মেঘলা আকাশে যেসকল কালো হয়, সেসকল নয়, সম্পূর্ণ আকাশটাই স্লেট রঙের।

রণজয়ের বুঝতে দেরি হল না যে, তারা একটা অন্য গ্রহে এসে পড়েছে। তাতেও রণজয় ভয় পেল না। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগেও অনেকবার হয়েছে।

গুটুলির দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। এই বেঁটে লোকটিকে সে চেনে বটে, কিন্তু কিছুতেই ওর নাম মনে করতে পারছে না। রণজয়ের নিজেরই নাম কী? তাও মনে নেই।

গুটুলিকে সে ধাক্কা দিয়ে জাগাল।

গুটুলি উঠে চোখ রগড়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কোন জায়গা?

রণজয় বলল, সেটা পরের কথা! আমাকে তুমি চেনো?

গুটুলি বলল, বাঃ, তোমাকে চিনব না কেন? এ কী জিজ্ঞেস করছ? তুমি তো তুমি!

আমার নাম কী?

তোমার নাম? তাই তো, তাই তো, মনে পড়ছে না।

হঁ! আমরা কোথা থেকে এসেছি, মনে আছে?

আমরা কোথা থেকে এসেছি? এই যাঃ! জানি না তো! তুমি বলে দাও!

আমরা কোথা থেকে এসেছি, তাও মনে নেই? এই জায়গাটা অচেনা লাগছে, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা অন্য কোথাও ছিলাম। সেই জায়গাটা কেমন?

কিছু মনে পড়ছে না যে!

রণজয় এবার একটু দমে গেল। কোন জায়গা থেকে এসেছে, তাই-ই যদি মনে না থাকে, তা হলে ফিরবে কী করে?

গুটুলি একটুখানি সামনে ঘুরে এল। কোনও গাছ বা প্রাণী কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাটিটা নরম, কিন্তু কাদা নেই।

গুটুলি বললে, খিদে পেয়েছে। কতদিন ভাত খাইনি। গরম গরম ভাত...

রণজয় বলল, ইস, আইসক্রিম খাওয়া হল না।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতন কাণ্ড ঘটল। কোথা থেকে দুটো থালা ফুটে উঠল ওদের সামনে। তার একটাতে ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত। আর একটাতে আইসক্রিম।

ওদের একেবারে চক্ষু ছানাবড়া।

রণজয় বলল, আমাদের নাম মনে নেই। কোথা থেকে একসঙ্গে এসেছি, তা মনে নেই। কিন্তু ভাত আর আইসক্রিমের কথা মনে থাকল কী করে?

গুটুলি বলল, কী জানি!

ভাতের সঙ্গে আর কী খায়?

মনে নেই। এগুলো কে দিয়ে গেল?

তা কী করে জানব?

ভাতটা গরম, আইসক্রিমটা ঠান্ডা। এ দুটোকে কি একসঙ্গে খায়? তাও জানি না।

খিদে পেয়েছে, খেয়ে তো নিই!

গুটুলিই আগে ভাতের সঙ্গে আইসক্রিম মিশিয়ে দলা পাকিয়ে মুখে দিয়ে বলল, আঃ! চমৎকার!

দু'জনে খুব তাড়াতাড়ি সবটা শেষ করে ফেলল।

তারপর দু'জনেই হেঁটে দেখতে লাগল জায়গাটা। রণজয়ের বুকটা ফাঁকা ফাঁকা আর হালকা লাগছে। অনেক কথা তার মনে নেই। ভাত আর আইসক্রিম ছাড়া আর একটা



খাবারের কথাও মনে পড়ছে না। অন্য কোনও মানুষের মুখ মনে পড়ছে না। জঙ্গল বা পাহাড়ের কথা মনে পড়ছে না।

এই গ্রহটা একেবারে সমতল। মানুষের থাকার মতন কোনও বাড়িঘর চোখে পড়ছে না। অনেক দূরে প্রকাণ্ড কয়েকটা কারখানা আছে, মনে হল। মাঝে মাঝে শূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রকেট। কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের গাড়িও চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে, কিন্তু তার যাত্রীদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভেতরে জোনাকির মতন আলো জ্বলছে আর নিভছে।

খানিকটা দূরে একটা মাঠের মধ্যে ঘুরছে কয়েকটা গোরু, ছাগল, ঘোড়া, জিরাফ, জেব্রা, খরগোশ, আরও অনেক জন্তু, যা ওরা আগে কখনও দেখেনি। গোরু-ছাগল-ঘোড়াগুলো দেখে ওরা চিনতে পারলেও তাদের নাম মনে নেই।

রণজয় একটা গোরুর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কী?

- গুটুলি বলল, এটা, এটা, এটা, তাই তো কী এর নাম?

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা অনেক কিছু ভুলে গেছি। এ কোন এক ভোলার দেশে এসে পড়লাম।

সেখানে ওদের কেটে গেল তিন দিন।

মাটিতেই শুয়ে থাকতে কোনও অসুবিধে নেই। এখানে রোদ ওঠে না, বৃষ্টি পড়ে না। যে-কোনও জায়গায় গেলে কেউ বাধা দেয় না।

ওরা খায় শুধু গরম ভাত আর আইসক্রিম। খিদে পেলে ওই দুটোর কথাই মনে পড়ে, অমনি দুটো থালা-ভরতি চলে আসে।

রণজয় বুঝতে পেরেছে যে, এই গ্রহের অধিবাসীদের মানুষের চোখের লেন্সে দেখা যায় না। মানুষের কাছে তারা অদৃশ্য। শুধু তাদের চোখগুলো জোনাকির মতন জ্বলে নেভে।

এখানে ইচ্ছাশক্তির খুব জোর আছে। ইচ্ছটাই বস্তু হয়ে যায়। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, স্মৃতিশক্তি এমনই কমে যায় এখানে যে, বেশি কিছু স্মৃতিতে থাকেই না।

এখানে থাকার কোনও অসুবিধা নেই। যেখান থেকে এসেছে, সেই পৃথিবীর কথা ওদের একটুও মনে নেই, তবু বুকের মধ্যে টনটন করে। কীসের যেন একটা দুঃখ ঘুমের মধ্যেও ওদের সঙ্গে থাকে।

এখানকার মাটি নরম। হাত দিয়ে দাগ কাটা যায়। গুটুলি একদিন নানারকম দাগ কাটছে, হঠাৎ রণজয় বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই যে তিনটে দাগ কাটলে এটা কীসের মতন দেখাচ্ছে বলো তো!

গুটুলি বলল, জানি না তো!

রণজয় বলল, একটা সোজা দাগ, আর বাঁ পাশে দুটো দাগ কোনাকুনি জোড়া। এটা হল ব।

ব? তার মানে কী?

ব হল একটা অক্ষর, আমরা যে কথা বলি, তার ব।

ঠিক তো। আমরা যে কথা বলি, তা লেখাও যায়। ব, তারপর কী মনে করতে পারছি না।

ব-এর পাশে একটা হাতের মতন দিলে ক হয় না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক। ঠিক। ক-এর মানে কী?

তা তো জানি না। তা হলে দুটো পেলাম, ব আর ক। বক! বক! খুব চেনা চেনা লাগছে। বক বলে কিছু একটা আছে, না?

হ্যাঁ, আছে। ওড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বক ওদের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটির ওপর বসল।

ওরা দু'জন তাকাল পরস্পরের দিকে। এবার স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এখানে যে-কোনও জিনিসের নাম উচ্চারণ করলেই সেটা বাস্তব হয়ে উঠবে। সেদিন আর কিছু মনে পড়ল না।

পরদিন সকাল থেকে প্রবল উদ্যমে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল রণজয়। বারবার লিখছে ব আর ক, বক, বক। আর প্রত্যেকবার ম্যাজিকের বক উড়ে যেতে লাগল সেখান দিয়ে।

অনেক আঁকিবুকি কাটার পর আবার একটা অক্ষর চিনতে পারল রণজয়। ন।

গুটুলিও বলল, ন। হ্যাঁ, ন!

রণজয় ক-এর পাশে ন বসাল। তারপর কন। কন মানে কী?

গুটুলি বলল, তা তো জানি না! তুমি ব-এর পাশে বসাতো তো!

রণজয় সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, বন, বন! বন মানে কী?

গুটুলি বলল, জানি জানি! বড় বড় গাছপালা। আমরা সেখানে ছিলাম।

ঠিক বলেছিস, গাছ! গাছ খুব লম্বা হয়। অনেক হাত থাকে।

ওই দেখো। একটা গাছ।

যেমনভাবে বক উড়ে গিয়েছিল, সেইরকমভাবে পরপর কয়েকটা গাছ গজিয়ে গেল সামনে। গজাতেই লাগল, একটা বন হয়ে গেল।

রণজয় বলল, বন কোথায় ছিল। ভাবো তো। সেটা অন্য গ্রহ। সেটার নাম কী?

গুটুলি বলল, বনের পাশে ছিল পাহাড়। বরফ!

রণজয় শূন্যে এক লাফ দিয়ে বলে উঠল, মনে পড়েছে। পৃথিবী! পৃথিবীতে বরফ থাকে। বন থাকে। মানুষ থাকে। গোরু-ছাগল-ঘোড়া থাকে। সব হয়ে যাক।

তক্ষুনি বিরাট এক গর্জন শোনা গেল, যেন শত শত বজ্রপাত হচ্ছে। মাটি দুলছে। রণজয় আর গুটুলি চোখে অন্ধকার দেখল, চোখ ঢেকে শুয়ে পড়ল।

খানিকবাদে থেমে গেল সব আওয়াজ। মাটিও আর কাঁপছে না।

চোখ মেলল ওরা দু'জন।

আবার বিষম অবাক হওয়ার পালা। ওদের সামনে তৈরি হয়ে গেছে এক পাহাড়। তার গায়ে কিছু কিছু জঙ্গল। সামনে ছড়ানো আছে বরফ।

একটা ডেকচিতে দুধ ফুটছে!

রণজয় বলল, তোর নাম তো গুটুলি। আমার নাম রণজয়। মনে পড়ে গেছে। দেখ গুটুলি, এই জায়গাটা আমাদের পৃথিবীর মতন হয়ে গেছে। অবিকল একরকম।

গুটুলি বলল, কিন্তু এই দুধের ডেকচিটা? মিষ্টির দোকান থেকে এনেছিলাম, সেটাও এখানে এল কী করে?

রণজয় বলল, সেটাও এখানে তৈরি হয়ে গেছে। আমরা যা ভাবব, তাই-ই হয়ে যাবে। ভালোই হল, অন্য একটা গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতন হয়ে গেল!

গুটুলি বলল, দাদা, এটা কি অন্য গ্রহ? নাকি আমাদের সেই পৃথিবীটা? দেখো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি পর্যন্ত পড়ে আছে। আমরা তো দেশলাইয়ে কথা বলিনি!

রণজয় বলল, তাই তো! তা হলে কি ওরা আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে গেল?

গুটুলি বলল, ফিরিয়ে দিল? আমরা কি কোথাও গিয়েছিলাম, না এখানেই ছিলাম? তিন-চার দিন ধরে কি এই দুধ ফুটছে? অথচ কত আইসক্রিম খেলাম!

রণজয় বলল, আমার আঙুলের কোণে ভিজে ভিজে মাটি কেন? আমি মাটিতে আঁকিবুকি কাটছিলাম। এখানে তো মাটি নেই, শুধু পাথর! তা হলে?

গুটুলি বলল, কী জানি দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওরা বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

নীল মানুষের খেলা

বাবা-মা'র সঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্ছে হাসি আর খুশি। ওরা দুই বোন যমজ। এখন বারো বছর বয়েস, কিন্তু ছবছ এক রকম দেখতে। একই রকম টানা টানা চোখ আর কৌকড়া কৌকড়া চুল। দু'জন সমান লম্বা, এক চুলও কম বেশি নয়। একমাত্র মা ছাড়া কেউ ওদের আলাদা করে চিনতে পারে না, এমনকী বাবাও মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলেন।

দু'জনে দু'রঙের ফ্রক পরে আছে। হাসি হলুদ আর খুশি গোলাপি। দু'জনের স্বভাবেও অবশ্য একটা তফাত আছে, যা অনেকে টের পায় না।

হাসি যখন তখন অবাক হয়, যে-কোনও নতুন জিনিস দেখলেই চোখ বড় বড় করে তাকায়, আর খুশি ঠোট উলটে বলে, এ আর এমন কী!

নামের সঙ্গে ওদের স্বভাব ঠিক মেলে না। হাসি যত না হাসে, তার চেয়ে ভয় পায় বেশি। আর খুশিকে খুশি করা খুব শক্ত।

ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। বাবা চালাচ্ছেন গাড়ি, পাশে বসে আছে হলুদ ফ্রক পরা হাসি। আর পিছনের সিটে, মায়ের পাশে গোলাপি ফ্রক পরা খুশি। মা ঘুমিয়ে পড়ছেন মাঝে মাঝে।

হঠাৎ হাসি চোঁচিয়ে উঠল, বাবা ও কে? ওই লোকটা কে?

বাবা বললেন, কোথায় কে?

হাসি বলল, ওই যে জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা নীল রঙের মানুষ!

বাবা বললেন, ধ্যাৎ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? নীল রঙের মানুষ আবার হয় নাকি?

পেছনের সিট থেকে খুশি বলল, আমিও দেখেছি। একটা বিচ্ছিরি নীল রঙের মানুষ!

হাসি বলল, আকাশের মতন নীল!

খুশি বলল, পেনের কালি বেশি পড়ে গেলে যেরকম ধ্যাবড়া হয়, সেইরকম নীল!

হাসি বলল, লোকটা প্রকাণ্ড লম্বা!

খুশি বলল, এমন কিছু লম্বা নয়। ছোটকাকার চেয়ে খানিকটা বেশি! ধ্যাড়েঙ্গা মতন!

বাবা গাড়িতে ব্রেক কষে বললেন, তোরা কী বলছিস রে? সত্যিই ওইরকম একটা মানুষ দেখেছিস নাকি?

মা এর মধ্যে জেগে উঠে ভয় পেয়ে বললেন, গাড়ি থামালে কেন? পালাও পালাও, নির্ঘাত ডাকাত!

খুশি বলল, ডাকাত না ছাই! হাতে বন্দুক টন্দুক কিছু নেই!

বাবা ড্যাশবোর্ড থেকে একটা রিভলভার বার করলেন। বেশি দূরে যেতে হলে তিনি সঙ্গে অস্ত্র রাখেন। তিনি সহজে ভয় পান না!

তিনি বললেন, দিনের বেলায় আবার ডাকাত আসবে নাকি? একবার নীল মানুষটাকে তো দেখতে হয়। মেয়েরা বলছে যখন!

রাস্তাটা ফাঁকা। অন্য গাড়ি বিশেষ নেই। বাবা গাড়িটাকে ব্যাক করে নিয়ে এলেন অনেকখানি। একটা ফুলভরতি বড় শিমূল গাছের কাছে আসতেই হাসি বলে উঠল, এইখানে। এইখানে দেখেছি!

বাবা-মা দু'জনেই সেদিকে তাকালেন। তারপর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

শিমূল গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে একজন বেঁটে মানুষ, সাড়ে তিন ফুটের বেশি নয়।

মনে হয় যেন বাচ্চা ছেলে, কিন্তু মুখটা বাচ্চাদের মতন নয়, গৌফ আছে। তার গায়ের রং নীল নয় মোটেই, সাধারণ মানুষের মতন।

বাবা বললেন, তোরা বুঝি আমার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করছিলি!

হাসি প্রতিবাদ করে বলে উঠল, না, না, আমি সত্যি দেখেছি। এই গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নীল রঙের একটা প্রকাণ্ড লম্বা মানুষ!

খুশি গম্ভীরভাবে বলল, লম্বা লোকটা বেঁটে হয়ে গেছে। আর গায়ের নীল রং মুছে ফেলেছে।

বাবা গাড়িটাকে আবার স্টার্ট দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, ইঞ্জিন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করে উঠলেও গাড়ি একটুও এগোল না।

এই সময় গাছতলা থেকে রাস্তার মাঝখানে এসে গুটুলি ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে বলল, গাড়ি যাবে না, যাবে না!

বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, কী হল? গাড়ি চলছে না কেন?

গুটুলি হাততালি দিতে দিতে বলল, যাবে না, যাবে না! আপনারা এখানে নেমে পড়ুন!

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, কেন, আমরা এখানে নামব কেন?

গুটুলি ধমকে একটুও ভয় না পেয়ে হেসে বলল, নামুন না! আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প করব!

হাসি বলল, গল্প শুনব, ওর গল্প শুনব!

খুশি বলল, ও আবার কী গল্প বলবে! পচা গল্প!

বাবা আরও জোর ধমক দিয়ে গুটুলিকে বললেন, আমাদের এখন গল্প শোনার সময় নেই। সরে যাও!

গুটুলি বলল, তা হলে আপনাদের গাড়ি পিছু হটবে!

সত্যিই তাই, ম্যাজিকের মতন, গাড়িটা ওর কথায় পেছন দিকে চলতে লাগল!

মা পেছন ফিরে তাকিয়েই ওরে বাবা রে বলে আঁত চিংকার করেই অজ্ঞান।
বাবা দেখলেন, একটা বিশাল লম্বা নীল রঙের মানুষ ঝুঁকে পড়ে গাড়িটা পেছন দিকে
টানছে!

হাসি বলল, দৈত্য! দৈত্য!

খুশি বলল, মোটেই দৈত্য নয়। একটা ধ্যাডেঙ্গা লোক!

বাবা ভয় পেলেন না বটে, কিন্তু তাঁর কপালে ঘাম জমে গেল। রিভলভারটা হাতে
নিয়ে কী করবেন ভেবে পেলেন না!

গাড়িটা এবার থেমে গেল।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কে? আমি এক্ষুনি গুলি
করব!

নীল মানুষটি হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আমার নাম রণজয়। আপনি
আমার দিকে রিভলভার তুলে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাদের কোনও ক্ষতি
করিনি!

বাবা দারুণ অবাক হয়ে বললেন, তুমি, তুমি বাঙালি?

রণজয় বলল, আপনার বাংলা কথা শুনে উত্তরে বাংলা কথা বললাম, তাতেও বুঝতে
পারলেন না?

খুশি ঠোট উলটে বলল, অনেক অবাঙালিরাও বাংলা বলতে পারে। আমাদের বাড়ির
সামনে যে পানওয়ালা, সে তো বিহারি, সেও সুন্দর বাংলা বলে!

বাবা জিজ্ঞেস করলেন তোমার এরকম বিকট চেহারা হল কী করে?

গুটুলি এবার কাছে এগিয়ে এসে চোখ পাকিয়ে বলল, খবরদার, আমার বন্ধুকে বিকট
বলবেন না! কোনও কোনও মানুষ কি লম্বা হয় না? গিনেস বুক অফ রেকর্ডে আছে,
পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা লোকটি আট ফুট চার ইঞ্চি!

রণজয় বলল, আমি তার চেয়ে মোটে একটুখানি বেশি। ন'ফুট দু' ইঞ্চি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গায়ে এরকম নীল রং মেখেছ কেন? সং সেজেছ?
রণজয় তার একটা হাত গাড়ির জানলায় রেখে খুশিকে বলল, তুমি দেখো তো খুকি,
এটা পাকা রং, না আমি রং মেখে সং সেজেছি?
অতবড় হাতের পাঞ্জাখানা এত কাছে দেখে খুশি অবাক হয়ে বলে উঠল, হি-ই-ই!
এত বড়? আর সত্যি সত্যি নীল!
হাসি খিলখিল করে হেসে উঠল। খুশি সহজে অবাক হয় না, আজ সে সত্যিকারের
অবাক হয়েছে।
খুশি তার বোনকে বলল, তোরও তো মুখে সহজে হাসি ফোটে না। এখন হাসছিস
যে বড়!
হাসি বলল, আমি ভয় পাইনি!
রণজয় খুশিকে বলল, খুকি চিমটি কেটে দেখো না, রং ওঠে কি না!
খুশি তার হাতে একটা রামচিমটি কেটে বলল, আমাকে খুকি বলবে না। আমি মোটেই
খুকি নই, আমার নাম খুশি!
মা এই সময় জ্ঞান ফিরে ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কী হল? কোথায় গেল?
চোখে ভুল দেখেছি!
তারপরেই আবার রণজয়কে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, ডাকাত! ডাকাত! মেয়ে
দুটোকে বাঁচাও! ওগো, তুমি গুলি করে মারছ না কেন?
বাবা রিভলভারটা পকেটে পুরে ফেলেছেন। তিনিও হাসছেন!
রণজয় বলল, বউদি, ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি রণজয়। আমি মোটেই ডাকাত নই!
হাসি বলে উঠল, কী মজা! কী মজা! এত বড় একটা লোক মাকে বউদি বলেছে!
মা বললেন, সত্যিই আমাকে বউদি বলে ডাকল নাকি রে?
বাবা বললেন, ওহে রণজয়, তুমি নীল মানুষ হলে কী করে?
রণজয় বলল, একটা অন্য গ্রহে গিয়েছিলাম, তাই গায়ের রংটা বদলে গেল!

খুশি ভুরু তুলে জিঞ্জেস করল, অন্য গ্রহে? সত্যি?
হাসি হাসতে হাসতে বোনকে বলল, তুই আবার অবাক হয়েছিস?
গুটুলি বলল, মোটে একটা গ্রহে যায়নি। অনেকগুলো ঘুরে এসেছে। সেই গল্প শুনতে
চাও?

দুই বোন একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ শুনব! হ্যাঁ শুনব!
বাবা বললেন, তা কী করে হবে? আমাদের রাঁচি পৌঁছোতে হবে সন্দের আগে। এর
মধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে! বরং ক্যামেরাটা বার কর, নীল মানুষের একটা ছবি
তুলে নে!

খুশির কাছে ক্যামেরা। সে নেমে এসে খচাখচ করে দু’-তিনটে ছবি তুলে নিল নীল
মানুষের। রণজয় বেশ পোজ দিয়ে দাঁড়াল।

গুটুলি বলল, কী স্বার্থপর! আমার ছবি তুলল না!
বাবা বললেন, তাই তো, তাই তো! খুশি ওরও ছবি তোলা।
এই সময় দূর থেকে আর একটা জিপ আসছে দেখা গেল। সেদিকে তাকিয়ে রণজয়
বলল, হুকুম সিং-এর দল মনে হচ্ছে। গুটুলি লুকিয়ে পড়!

চোখের নিমেষে রণজয় আর গুটুলি ঢুকে গেল জঙ্গলে।
বাবা বললেন, কী ব্যাপার, ওরা পালাল কেন?
জিপটা কাছে এগিয়ে আসছে।
বাবা বললেন, খুশি উঠে পড়। আমরা এগোই!
ওদের গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে একটুখানি যেতে না যেতেই জিপটা খুব জোরে এসে
আটকে দিল ওদের রাস্তা। রাইফেল নিয়ে দুটো লোক নেমে পড়ে বলল, বাঁচতে চাও
তো থামো!

বাবা দেখলেন, এদের রাইফেলের সঙ্গে রিভলভার দিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না।
তিনি বললেন, তোমরা কী চাও?

একজন রাইফেলধারী বলল, হুকুম সিং-এর হুকুম! এই রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে খাজনা দিতে হবে! সঙ্গে টাকাকড়ি, গয়নাগাটি যা আছে দিয়ে দাও!

বাবা বললেন, তোমরা ডাকাতি করতে এসেছ? জানো, আমি একজন সরকারি অফিসার?

রাইফেলধারী বলল, চুপ! বেশি বকবক করবি না! বাঁচতে চাস তো যা আছে সব দিয়ে দে। নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!

খুশি বলল, এই আমার বাবাকে তুই তুই বলছ কেন?

অন্য রাইফেলধারী বলল, বাঃ বাঃ! এই ফুটফুটে মেয়ে দুটোকেও ধরে নিয়ে যাব?

বাবা হতাশভাবে এদিক ওদিক তাকালেন। লম্বা নীল মানুষটাও ডাকাত দেখে ভয়ে পালাল। কাপুরুষ!

জিপগাড়ির ড্রাইভার নেমে এসে বলল, কই দেখি, গয়নাটয়না কী কী আছে? সঙ্গে খাবারদাবারও আছে নাকি!

ঠিক এই সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে দুটো দড়ির ফাঁস উড়ে এসে রাইফেলধারী দু'জনের গলায় লাগল। তারপর তাতে টান পড়তেই লোক দুটো ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। গলায় ফাঁস লেগে প্রায় দম বন্ধ অবস্থায় তারা গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

জঙ্গল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল গুটুলি। রাইফেল দুটো কেড়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলল, এবার ফাঁস আলগা করে দাও! না হলে মরে যাবে!

ফাঁস আলগা হয়ে যেতেই লোক দুটো আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়াল। জিপগাড়ির ড্রাইভারটা এই কাণ্ড দেখে ভয়ে ভয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই গুটুলি প্রায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে তার মুখে একটা লাথি কষাল!

ওইটুকু মানুষ এমন ক্যারাটের প্যাঁচ জানে দেখে হাসি আর খুশি হেসে ফেলল ঝরঝর করে।

এবার নীল মানুষ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করল, এই, তোদের সর্দার হুকুম সিং কোথায়?



নীল মানুষের বজ্রের মতন গলার আওয়াজ শুনে ওরা কেঁপে উঠলেও মুখে কিছু বলল না।

নীল মানুষ তখন বাবার দিকে ফিরে বলল, এই হুকুম সিং-এর দলবল এই রাস্তার যাত্রীদের বড্ড জ্বালাতন করে। কিন্তু সেই লোকটা এত ভিত্তি যে নিজে কখনও আসে না। তাকে দেখতে পেলে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেব।

খুশি বলল, নীল মানুষ, ওরা আমার বাবাকে অপমান করেছে। ওদেরও শিক্ষা দাও তো!

নীল মানুষ হেসে বলল, আমায় কিছু করতে হবে না। গুটুলি দিয়ে দেবে।

সেই লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, এই তোরা তো তিনজন আছিস! একা একা কে গুটুলির সঙ্গে লড়তে পারবি? খালি হাতে?

জিপগাড়ির ড্রাইভারটা একটা লাথি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আর উঠল না। অন্য লোকদুটো বলল, আমরা মাপ চাইছি। আমাদের ছেড়ে দাও! আমাদের দোষ নেই, হুকুম সিং পাঠিয়েছে!

নীল মানুষ বলল, যেই ধরা পড়ে গেলি, অমনি মাপ চাইছিস! আমি আর গুটুলি না থাকলে এঁদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিতিস না? এখন লড়বি না মানে, লড়তেই হবে!

একজনের চুলের মুঠি ধরে উঁচু করে সে ফেলে দিল গুটুলির সামনে। গুটুলি আদর করার মতন তার দুই গালে ছোট ছোট চড় মারতে লাগল। তারপর একখানা রাম চড় মেরে ফেলে দিল চিত করে।

অন্য লোকটি বলল, ঠিক আছে, আমি লড়ব।

সে গুটুলির দিকে একটা ঘুষি ছুড়তেই সে ফুডুত করে সরে গেল। তারপর লোকটা যতই মারতে যায়, গুটুলিকে ছুঁতেই পারে না।

নীল মানুষ হাততালি দিয়ে বলছে, বা বা, লড়ে যাও! লড়ে যাও!

একবার গুটুলি এক লাফে লোকটার পেছন দিক দিয়ে ওর ঘাড়ে চড়ে বসল। দু'হাতে চেপে ধরল লোকটার চোখ। সে আর কিছুতেই গুটুলিকে ফেলতে পারে না। কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, ছেড়ে দাও, আমি হেরে গেছি।

নীল মানুষ বলল, হেরেছ তো? বেশ! এবার ঘোড়া ঘোড়া খেলা হবে! তুমি ঘোড়া হও, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো, গুটুলি তোমার পিঠে চাপবে।

লোকটা আর প্রতিবাদ করার সাহস পেল না। গুটুলি তার পিঠে চেপে বলল, এই ঘোড়া হ্যাট হ্যাট!

অন্য লোকটা জুলজুল করে চেয়ে দেখছে।

নীল মানুষ তাকে বলল, কী হে, আমি তোমার পিঠে চাপব নাকি?

সেই লোকটা অমনি নীল মানুষের পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে বলল, দয়া করুন, দয়া করুন। আপনি চাপলে আমি চিড়েচ্যাপটা হয়ে যাব।

হাসি আর খুশি এত বেশি হাসছে যে থামতেই পারছে না। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

বাবা একসময় বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমাদের যেতে হবে! নীল মানুষ, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব? তুমি আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছ তো বটেই, টাকাকড়িও বাঁচিয়েছ। তা ছাড়া আমার এই মেয়ে দুটি, ওদের নাম হাসি আর খুশি হলেও ওদের আমি একসঙ্গে এত হাসতে দেখিনি কখনও!

নীল মানুষ বলল, জঙ্গলে তো আমাদের সময় কাটে না। তাই মাঝে মাঝে আমরা এরকম খেলা করি।

গুটুলি কাছে এসে বলল, শুধু নীল মানুষকে ধন্যবাদ দিলেন, বাঃ, আমি বুঝি কিছু করিনি? আমার ছবিও তোলা হল না!

বাবা বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তুমিও অনেক কিছু করেছ। ছোট্ট চেহারা হলেও তোমার অনেক শক্তি। খুশি, ওর ছবি তোলা!

নীল মানুষ এবার গুটলিকে তুলে নিল নিজের কাঁধে। গুটলি দু'দিকে পা ঝুলিয়ে
বসল। ক্যামেরার দিকে চেয়ে সে গান গেয়ে উঠল:

আমরা দুটি ভাই
লোককে তাক লাগাই
টাকাপয়সা কিছু চাই না
শুধু মজা চাই...

পৃথিবীতে নীল মানুষ

রণজয়কে অন্য গ্রহের প্রাণীরা বারবার ধরে নিয়ে যায়। কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না। তারা মনে করে, রণজয় এই পৃথিবীর মানুষ নয়। অথচ রণজয় পৃথিবীকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

আরও একবার রণজয় ধরা পড়ল ওদের হাতে। গুটুলি কিংবা রঘু জানতেও পারেনি, ঘুমের মধ্যে ওরা রণজয়কে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রণজয়কে আটকে রাখা সহজ নয়। কোনও বন্ধনই সে মানে না।

রণজয় আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে।

কী করে যে সে বেঁচে গেল, তা সে নিজেই জানে না। অন্য গ্রহের রকেটটা এলোমেলোভাবে ঘুরছিল মহাশূন্যে। যে পুতুল মেয়েটি রকেট চালাচ্ছিল সে হঠাৎই থেমে গিয়েছিল এক সময়। আর নড়ে না, চড়ে না। ওদের বোধহয় কোনওরকম দম দেবার ব্যাপার আছে। নির্দিষ্ট সময়ের পর দম ফুরিয়ে গেলেই অকেজো হয়ে যায়। তখন সে সত্যিই পুতুল।

রণজয় রকেট চালাতে জানে না, সেই জন্য তার আর পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা ছিল না। সে ভেবেছিল, মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতেই তার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে।

তারপর একসময় রকেটটা বিস্ফোরণ হল। রকেটটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতেই রণজয়ও ছিটকে পড়ল বাইরে। অজ্ঞান হওয়ার আগের মুহূর্তে সে ভাবল, এই তা হলে শেষ?

আসলে, রকেটটা কোনওরকমে পৃথিবীর বায়ুস্তরে হঠাৎ একবার ঢুকে পড়তেই ফেটে যায়। সেইসঙ্গে যে রণজয়ও মরে গেল না, তার কারণ সে তো আর মানুষ নয়। অন্য গ্রহের প্রাণীদের একটা গোল বল ছুঁয়ে ফেলার জন্য সে এখন একদম বদলে গেছে। এখন সে প্রায় আট ফুট লম্বা একটা দৈত্য, তার গায়ের রং আকাশের মতন নীল, শরীরে অসম্ভব শক্তি।

অজ্ঞান অবস্থায় একটা পালকের মতন ভাসতে ভাসতে রণজয় নেমে এল পৃথিবীতে। সে কোনও বাড়ির ছাদ কিংবা কোনও রাস্তায় গাড়িঘোড়ার মাঝখানেও পড়তে পারত। সেরকম কিছু হলে বেশ একটা মজার ব্যাপারই হত।

কিন্তু রণজয় এসে পড়ল একটা নদীর ধারে। অর্ধেকটা শরীর জলে আর অর্ধেকটা মাটিতে। তখন শেষরাত, সেইজন্য আকাশ থেকে কেউ তাকে নামতে দেখেনি।

রণজয়ের মাথাটা জলের মধ্যে পড়েছিল বলেই তার তক্ষুনি জ্ঞান ফিরে এল। ধড়মড় করে উঠে বসে ভাবল, তা হলে আমি এখনও বেঁচে আছি?

প্রথমে সে বুঝতেই পারল না, এটা কোন জায়গা? নতুন কোনও গ্রহ হতে পারে। এর আগে মহাকাশে অনেক গ্রহ সে দেখেছে। প্রত্যেকটাতেই কিছু-না-কিছু বিপদ আছে।

রণজয় একটা ঝোপের আড়ালে লুকোল।

প্রথমে এল একটা কুকুর। রণজয় অবাক হয়ে গেল। এটা তো তার চেনা প্রাণী। অন্য গ্রহেও কি কুকুর আছে? রণজয় বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, সে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।

ভোরের আলো ফোটবার পরও রণজয়ের সন্দেহ কাটল না। কয়েকজন মানুষকে দূর থেকে দেখে তার মনে হল, হ্যাঁ, এটা অন্য কোনও নতুন গ্রহই হবে।

আসলে রণজয় যে নদীর ধারে পড়েছে, সেই নদীর নাম ইরাওয়াডি। দেশটা হল বার্মা। এখানকার মানুষরা ফরসা ফরসা, চ্যাপটা নাক, চোখ ছোট, লুঙ্গি আর ব্লাউজের মতন পোশাক, সেইজন্য রণজয় চিনতে পারেনি। সে অনেক গ্রহতে ঘুরেছে, কিন্তু এই

পৃথিবীতে বাংলা ছাড়া আর কোনও দেশ তো দেখেনি। বার্মিজদের ভাষাও সে বুঝতে পারছে না।

ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকবার পর রণজয় বুঝল যে, এরকমভাবে তো সময় কাটালে চলবে না। বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতেই হবে। জোগাড় করতে হবে খাবার।

এই মানুষের মতন চেহারার প্রাণীগুলি কি তার শত্রু? অবশ্য এদের ছোট্টখাটো চেহারা, এরা আট-দশজন মিলেও রণজয়কে কাবু করতে পারবে না।

একটা ছোট্ট সাম্পান নৌকো এসে থামল তার কাছেই। নৌকোতে ভরতি রয়েছে কলা। দু'জন বর্মি মাঝি নৌকোটা চালিয়ে এনেছে।

রণজয় ঝোপ থেকে বেরিয়ে নৌকোটার কাছে যেতেই বর্মি মাঝি দুটির চোখ কপালে উঠে গেল। এ তারা কী দেখছে? একটা নীল রঙের দৈত্য?

রণজয় বলল, আমার খিদে পেয়েছে। কয়েকটা কলা দেবে?

রণজয়ের বাংলা কথা তো তারা বুঝলই না। তারা দু'হাতে কান চাপা দিল।

রণজয় জানে না যে, তার গলার আওয়াজটাও সাংঘাতিক বদলে গেছে। সে কথা বললেই মেঘ ডাকার মতন শব্দ হয়।

রণজয় আর এক পা এগোতেই বর্মি মাঝি দু'জন ভয়ের চোটে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

রণজয় আর খিদে সামলাতে না পেরে টপাটপ করে কলা তুলে খেতে লাগল। সে ভাবল, বাঃ, এর স্বাদ তো পৃথিবীর কলারই মতন।

আমরা যেমন চিনেবাদাম খাবার সময় গুনি না যে, ক'টা খাচ্ছি, সেই রকমই রণজয় আপন মনে পঞ্চাশ-ষাটটা কলা খেয়ে ফেলল। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আঃ।

বর্মি মাঝি দু'জন কিন্তু ভিত্তি নয়। তারা প্রথমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সাঁতারে একটু দূরে গিয়ে উঠল। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে চলে এল নৌকোর কাছে। একটা দৈত্য তাদের



সব কলা খেয়ে নিচ্ছে দেখে তারা আর রাগ সামলাতে পারল না। এই নদীতে খুব ডাকাতির ভয় আছে বলে ওরা সব সময় কাছে একটা করে ছুরি রাখে। দু'জনে দুটো ছুরি হাতে নিয়ে তেড়ে এল রণজয়ের দিকে।

একজনের ছুরি গেঁথে গেল রণজয়ের পিঠে। আর একজনের হাত সে ধরে ফেলল। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিতেই সে অজ্ঞান। অন্য লোকটা এবার কাঁপতে শুরু করেছে। একটা ছুরি অতখানি বসিয়ে দেবার পরও দৈত্যটা একটু উঃ পর্যন্ত করল না।

রণজয় সেই লোকটিকে দু'হাতে ধরে উঁচুতে তুলল। তারপর কটমট করে তাকিয়ে বলল, দেব শেষ করে?

এতেই সেও জ্ঞান হারাল।

রণজয় অবশ্য ওদের মেরে ফেলতে চায়নি। নিজের পিঠ থেকে ছুরিটা তুলে এনে সে দেখল মনোযোগ দিয়ে। পৃথিবীর মানুষের ছুরিরই মতোই তো! নৌকো, মানুষ, কলা, ছুরি, তা হলে কি এই জায়গাটা পৃথিবী?

অজ্ঞান লোক দুটিকে নৌকোটাতে চাপিয়ে নৌকোটা জোরে ঠেলে দিল রণজয়। সেটা আপনা আপনি ভেসে চলল। খানিকবাদে জ্ঞান হলে ওই মাঝি দু'জন বোধহয় ভাববে যে, ওরা দু'জনেই একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

রণজয় বুঝতে পারল, তার পক্ষে দিনের বেলা চলাফেরা করা সম্ভব নয়। সবাই তাকে দেখে ভয় পাবে কিংবা মারতে আসবে। সে তো কারুর সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় না, সে শুধু বাঁচতে চায়। তার চেহারাটা যে বদলে গেছে, সেটা কি তার দোষ?

সারাটা দিন নদীর ধারেই কাটিয়ে দিল সে। তার খুব মন খারাপ লাগছে। তার খুব ইচ্ছে করছে, একটা নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে। একটু ভাত-ডাল মাছের ঝোল খেতে। কতদিন সে ভাত খায়নি।

রাতির গভীর হওয়ার পর রণজয় হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ হাঁটবার পর এসে পৌঁছোল একটা শহরের কাছাকাছি। অনেক রাত হলেও এখনও দু'-একটা গাড়ি চলছে,

কয়েকটা দোকানের দরজা বন্ধ থাকলেও ভেতরে জ্বলছে আলো।

খুব সাবধানে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে লাগল রণজয়। পড়বার চেষ্টা করল দোকানের সাইনবোর্ড। বেশির ভাগই বার্মিজ ভাষায় লেখা, এক জায়গায় পাওয়া গেল ইংরেজি। তাতে রণজয় বুঝল, এই শহরটার নাম প্রোম।

রণজয় যদিও বি এ পাশ, তবু প্রোম শহরটা কোন দেশে তার মনে পড়ল না। আরও একটুখানি গিয়ে একটা প্যাগোডা দেখতে পেয়ে সে বুঝতে পারল, তা হলে সে বার্মায় এসে পড়েছে।

তার মনটা দমে গেল।

এই বার্মা মূলুকে সে এখন কী করবে? তার মন টানছে বাড়ির দিকে। এখান থেকে তার বাড়ি যে অনেক দূর।

এর মধ্যেই রণজয়ের আবার খিদে পেয়ে গেছে।

খাবার পেতে হলে কারুর-না-কারুর কাছ থেকে তাকে জোর করে কেড়ে নিতে হবে। অথচ সে তো চুরি-ডাকাতি করতে চায় না। কিন্তু আর উপায়ই বা কী?

হঠাৎ দুম দুম করে গুলির শব্দ হতেই রণজয় একটা গুলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর উঁকি দিয়ে দেখল, তিনজন লোক একটা গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা দোকানের দিকে গুলি ছুড়ছে। দোকানের ভেতর থেকেও কেউ চালাচ্ছে গুলি। কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ির জানলা খুলে গেছে, রাস্তায় এসে পড়েছে আলো। কিন্তু কোনও লোক বাইরে বেরিয়ে এল না।

খানিকক্ষণ গুলির যুদ্ধ চলবার পর দোকানের ভেতর থেকে আর কোনও গুলি এল না। রাস্তার তিনটে লোক গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল দোকানটার দিকে।

এবার রণজয়ও গুলি ছেড়ে চলে এল সেখানে।

পিস্তলওয়ালা লোক তিনটে দোকানের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যেতেই রণজয় পেছন থেকে দু'জনের কাঁধ চেপে ধরল।

লোক দুটি মুখ ফিরিয়ে রণজয়কে দেখেই চৌচিয়ে উঠল আঁ আঁ করে।

রণজয় মাথা ঠুকে দিল লোক দুটির। ইচ্ছে করেই সে খুব জোরে ঠুকে দেয়নি, তা হলে ওদের মাথা ছাতু হয়ে যেত একেবারে।

তৃতীয় লোকটিও পেছন ফিরে এত অবাক হয়ে গেছে যে, গুলি ছুড়তে ভুলে গেছে।

এবার রণজয় ওর দিকে হাত বাড়াতেই লোকটি কী যেন বলে উঠে গুলি চালাল।

গুলি লাগল রণজয়ের বাঁ হাতের তালুতে। সাধারণ লোক এরকম অবস্থায় যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বসে পড়ে। কিন্তু রণজয়ের তেমন কিছু ব্যথা লাগল না। বরং খানিকটা বিরক্ত হল। সে অন্য হাত দিয়ে সেই লোকটিকে এমন জোরে একটা চড় কষাল যে, লোকটা তিন-চার পাক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়েই অজ্ঞান। আগের দুটো লোকেরও কোনও সাড়া নেই।

যেসব বাড়ির জানলা খুলে গেছে, সেখান থেকে অনেকেই নিশ্চয়ই দেখছে এই দৃশ্য। তারা কী ভাবছে, কে জানে? হয়তো তারা নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

রণজয় এবার দোকানটার ভেতর ঢুকে দেখল, একজন বুড়ো মতন লোক রক্তাক্ত অবস্থায় চিত হয়ে পড়ে আছে। তার পাশে একটা রাইফেল। হয়তো বাইরের ওই লোক তিনটির সঙ্গে এর কোনও পুরনো শত্রুতা ছিল।

রণজয় হাঁটু গেড়ে বসে লোকটির নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল, এখনও নিশ্বাস পড়ছে। একটা গুলি লেগেছে বুড়ো লোকটির কাঁধে। তবে রণজয় দেখল, গুলিটা ভেতরে গেঁথে যায়নি, ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

দোকানটা নানারকম খেলনার জিনিসপত্রের। পেছন দিকে আর একটা ঘর। রণজয় সেই ঘরে ঢুকে দেখল, সেটা ওই বুড়ো লোকটির শোবার ঘর। সেখান থেকে একটা তোয়ালে এনে জলে ভিজিয়ে রণজয় লোকটির ক্ষতস্থানটা মুছে কোনওরকমে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। রণজয়ের নিজেরও বাঁ হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু সে এখানে বেশি সময় নষ্ট করতে চায় না।

আবার পাশের ঘরে গিয়ে একটা ফ্রিজ খুলে দেখল, তার মধ্যে অনেকগুলো ডিম রয়েছে। আর কিছু আলু। একটা কাগজের বাস্কেতে ডিম আর আলুগুলো ভরে, রণজয় একটা দেশলাই খুঁজতে লাগল। তাও পেয়ে গেল। তখন সেগুলো নিয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে। বুড়ো লোকটির সে প্রাণ বাঁচিয়েছে, এই ক'টা জিনিস নিলে সে নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

দূরে কয়েকটা গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই পুলিশ আসছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে রণজয় দৌড় লাগাল উলটো দিকে।

রণজয় থামল একটা জঙ্গলে এসে।

কাঠকুটো জড়ো করে এবার সে আগুন জ্বালতে পারবে। কিন্তু আলু আর ডিমগুলো সেদ্ধ করবে কী করে? কোনও ডেকচি কিংবা হাঁড়ি তো আনেনি। ইস, খুব ভুল হয়ে গেছে তো!

বর্মি জেলে দু'জনের কাছ থেকে একটা ছুরি রণজয় নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। এই জঙ্গলে অনেক বুনো কলাগাছ আছে। সেই ছুরি দিয়ে রণজয় একটা কলাপাতা কেটে আনল। শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বলে তার মধ্যে ফেলে দিল আলুগুলো। তারপর ডিমগুলো ভেঙে ভেঙে গুলতে লাগল কলাপাতায়। তারপর সেই কলাপাতাটা আগুনের ওপর একটু উঁচু করে খানিকক্ষণ ধরে রাখতেই দিব্যি ওমলেট হয়ে যেতে লাগল।

আলুপোড়া আর ডিমভাজা দিয়ে খাওয়াটা মন্দ হল না। একটু নুন থাকলে আরও চমৎকার হত।

সেখানেই শুয়ে পড়ে রণজয় মনে মনে ঠিক করল, পায়ে হেঁটেই সে বর্মা দেশ ছেড়ে ভারতে ঢুকবে।

বর্মা দেশে জঙ্গলের অভাব নেই। এরপর ক'দিন ধরে রণজয় দিনের বেলা কোনও জঙ্গলে ঘুমোয় আর রাত্তিরে হাঁটে। মধ্যে একদিন ঘুমের মধ্যে একটা বিরাট পাইথন সাপ

জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। জেগে উঠে সে সাপটার মুখটা চেপে ধরে খুব জোরে নিশ্বাস নিতেই সেটা দড়ির মতন ছিঁড়ে গেল পটপট করে।

রণজয়ের একটা চিন্তা ছিল যে সীমান্তটা পার হবে কী করে? সীমান্তে তো মিলিটারি থাকে তারা যদি গুলি চালায়?

কিন্তু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রণজয় যে কখন ভারতবর্ষে এসে পড়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। জঙ্গলের বাঘ, ভালুক, হরিণদের তো পাসপোর্ট লাগে না, তারা অনায়াসেই এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যেতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে সব জায়গায় মিলিটারি পাহারাও থাকে না।

এক রাত্তিরে একটা শহরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রণজয় দেখল, সেখানকার একটা দোকানে বাংলা অক্ষরে নাম লেখা। রণজয় চমকে উঠল, তা হলে সে বাংলায় পৌঁছে গেছে?

সেটা আসামের একটা শহর। বাংলা আর অসমীয়া ভাষার অক্ষর তো একই রকম। আরও দু’-একটা দোকান দেখার পর সেটা বুঝতে পেরেও খুব আনন্দ হল রণজয়ের। আসামে পৌঁছোলে আর বাংলা কতদূর।

সেই রাতেই সে জঙ্গলের মধ্যে একজন লোকের মুখোমুখি পড়ে গেল।

রণজয় একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আসামের জঙ্গলে ঘুমোনো বড় মুশকিল। বড্ড জোঁক। মাঝে মাঝেই গা থেকে টেনে টেনে জোঁক ছাড়াতে হয়। তবু একটু ঘুম এসেছিল, একটা গুলির শব্দে সে চমকে উঠল।

তারপরেই সে দেখল, একটা হরিণ হুড়মুড় করে ছুটে এসে প্রায় তার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। রণজয় উঠে গিয়ে হরিণটাকে ধরতে যেতেই টর্চের আলো ফেলে ছুটে এল একজন লোক।

লোকটি পরে আছে একটা খাকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতে টর্চ। রণজয়কে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটি বলল, এ কী?

লোকটি রাইফেল তুলতেই রণজয় বলল, গুলি করে কোনও লাভ হবে না। যদি বাঁচতে চান, তবে চুপ করে আমার কথা শুনুন আগে।

লোকটি ভয় না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

রণজয় কথা বললেই মেঘ ডাকার মতন আওয়াজ হয় বলে এবার সে ফিসফিস করে বলে, আমি একজন মানুষ। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি দৈত্য নই, ভূত-প্রেত কিছু নই।

লোকটি বলল, মানুষ? এরকম কোনও মানুষ হয়?

রণজয় বলল, একটা দুর্ঘটনায় আমার চেহারা এরকম হয়ে গেছে। পরে সব বুঝিয়ে বলতে পারি। এবার বলুন, আপনি কে?

লোকটি একটি চা-বাগানের ম্যানেজার। এই জঙ্গলটা সেই চা-বাগানের সঙ্গেই ওদেরই সম্পত্তি। এই জঙ্গলে অন্য কারুর ঢোকা নিষেধ।

সব শুনে রণজয় বলল, আপনি আমাকে দেখে ভয় পাননি, সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, আমি কারুর কোনও ক্ষতি করতে চাই না। আমার চেহারাটা এরকম হলেও আমি অন্যদের মতনই একজন সাধারণ মানুষ। আমি রাতের পর রাত হেঁটে, জঙ্গলে থেকে থেকে খুবই ক্লান্ত। আমাকে আপনার বাড়িতে একটু আশ্রয় দেবেন? আমি একটু বিছানায় শুতে চাই, বাড়ির রান্নাকরা খাবার খেতে চাই। তার বদলে আপনি যা বলবেন, সেই কাজ আমি করে দিতে পারি।

ম্যানেজারটি বললেন, এসো।

রণজয় মরা হরিণটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলল ম্যানেজারের পেছনে পেছনে।

বাংলোর কাছাকাছি এসে ম্যানেজার বললেন, তোমাকে দেখলেই তো আমার সব লোকজন ভয় পেয়ে যাবে। তুমি চুপিচুপি ওই পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ওপরে চলে যাও, তারপর আমি আসছি।

ম্যানেজারটি অবিবাহিত। বাংলোর নীচতলায় অনেক আদালি আর বেয়ারা থাকে,

ওপরের তলাটা ফাঁকা। সেখানে তিনি রণজয়কে অনেক রকম খাবার খেতে দিয়ে বললেন, এবার শোনাও তো তোমার কাহিনিটা। তুমি সত্যিই মানুষ, না অন্য গ্রহের প্রাণী?

রণজয় নিজের সব ঘটনা খুলে বলল, একে একে। ম্যানেজার চোখ গোল গোল করে শুনে গেলেন। ঠিক যেমনভাবে বাচ্চা ছেলেরা রূপকথার গল্প শোনে।

অনেক কিছু খাওয়ার পর রণজয়ের ঘুম পেয়ে গেল। ম্যানেজার বললেন, ঠিক আছে। আজ রাতটা ঘুমিয়ে কাটাও, কাল সকালে আবার শোনা যাবে। কিন্তু কোনও খাটে তো তুমি আঁটবে না। মেঝেতে কতকগুলো তোষক পেতে দিচ্ছি, সেখানে ঘুমোও বরং।

নিজেই তিনি অন্য ঘর থেকে তিন-চারখানা তোষক বয়ে আনলেন। সেগুলো জোড়া দিয়ে বিছানা পাতা হল, রণজয় শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

প্রায় তার মনে পড়ে গুটুলির কথা। এই পৃথিবীতে গুটুলিই তার একমাত্র বন্ধু। কিন্তু কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে?

একটু বাদে ম্যানেজারবাবুটি এক গেলাস শরবত নিয়ে এসে বললেন, তুমি তো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে, এই শরবতটা খেয়ে নাও, কাল সকালে একেবারে চাঙ্গা হয়ে যাবে।

রণজয় যখন ঢকঢক করে শরবত খেতে লাগল, তখন মুচকি হাসলেন ম্যানেজার।

পরদিন রণজয়ের ঘুম ভাঙল প্রায় দশটার সময়। ঘুম নয়। আসলে সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। ম্যানেজারটি শরবতের মধ্যে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

রণজয় দেখল, তার হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচজন লোক। ম্যানেজারবাবু বলছেন, থানায় খবর পাঠিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে পুলিশের গাড়ি। খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারদেরও ডাকতে হবে। ভেবে দেখো তো, সবাই যখন জানবে, তখন কী দারুণ কাণ্ড হবে। আসামের জঙ্গলে অতিকায় মানব! আমার ধারণা, এ নিশ্চয়ই অন্য গ্রহ থেকে এসেছে। এরকম গায়ের রং কোনও মানুষের হয় না। আমিই

ওকে আবিষ্কার করেছি। দেখো, রাশিয়া আমেরিকা থেকেও বৈজ্ঞানিকরা আসবে ওকে দেখতে।

একজন বলল, কিন্তু ওকে রাখা হবে কোথায়? এই চা-বাগানে থাকলে তো অনেকেই দেখতে পাবে না।

ম্যানেজার বললেন, ভাবছি গৌহাটির চিড়িয়াখানায় একটা শক্ত লোহার খাঁচায় রাখলে কেমন হয়?

রণজয় উঠে বসে বলল, না!

অন্য লোকেরা সেই গর্জন শুনে ভয়ে দৌড়ে চলে গেল দরজার দিকে। সেখান থেকে একজন বলল, ও ম্যানেজারবাবু এ যে আমাদের মতন কথা বলে।

ম্যানেজার বললেন, অন্য গ্রহের লোকদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। ওরা সব ভাষায় কথা বলতে পারে।

তারপর রাইফেলটা তুলে রণজয়ের দিকে তাক করে বললেন, চুপ করে শুয়ে থাকো, নড়লেই গুলি করব।

রণজয় হাতের বাঁধনটা টেনে খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু খুবই শক্ত নাইলনের দড়ি, ছেঁড়া গেল না। তখন সে ম্যানেজারের দিকে তীব্র চক্ষে তাকিয়ে বলল, বিশ্বাসঘাতক! আমাকে আশ্রয় দিয়ে তারপর এই ব্যবহার? কতবার বললাম না যে, আমি মানুষ। আমার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেলেও আমার মনটা মানুষেরই মতন! আমাকে কেন চিড়িয়াখানায় রাখবে, আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছে?

ম্যানেজার বললেন, খবরদার! কোনও কথা শুনতে চাই না।

তখনই এসে গেল পুলিশের গাড়ি। রণজয়কে দেখে দারোগা আর দু'জন পুলিশের তো চক্ষু ছানাবড়া!

দারোগা বলল, এটা কী মশাই? ব্রহ্মদৈত্য?

রণজয় বলল, না, আমি মানুষ। আমায় ছেড়ে দিন।

তারপর সে কাঁদতে শুরু করল হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। কান্নায় তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দারোগা বলল, আরে, এ যে মানুষের মতন কাঁদে।

রণজয় আবার মুখ তুলে বলল, এবার দেখাচ্ছি আমি মানুষ না অন্য কিছু!

আসলে কান্নার ছল করে মুখ নিচু করে রণজয় হাতের বাঁধনটা দাঁত দিয়ে কাটছিল। তার দাঁতে যথেষ্ট ধার।

একজন অত বড় চেহারার দৈত্যকে হঠাৎ কাঁদতে দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এরই মধ্যে এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে রণজয় দারোগাকে ধরে ফেলে ওপরে তুলে ফেলল। তারপর বলল, কেউ গুলি চালাবার চেষ্টা করলে আপনাকে আছাড় মারব, একেবারে ছাতু হয়ে যাবেন।

দারোগাটি হাত-পা ছুড়ে ওরে বাবা রে, মা রে বলে চিৎকার করতে লাগল।

রণজয় আবার বলল, কারুক বেলুন, আমার পায়ের বাঁধন খুলে দিতে।

দারোগা বলল, ওরে দে, শিগগির দে! আমায় মেরে ফেললে।

একজন কনস্টেবল কাঁপতে কাঁপতে এসে খুলে দিল রণজয়ের পায়ের দড়ি।

রণজয় দারোগাকে সেই অবস্থায় উঁচুতে তুলে রেখে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। সবাই ভয়ে তাকে রাস্তা ছেড়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে এসে রণজয় দারোগাকে বলল, আমি মানুষের মতন বাঁচতে চাই, আপনারা আমাকে বাঁচতে দেবেন না?

তারপরই দারোগাকে একটা পেয়ারা গাছের ডালের ওপর বসিয়ে দিয়ে সে প্রচণ্ড জোরে দৌড় লাগল। ম্যানেজারবাবুটি এই সময় রাইফেল টিপ করে দু'বার গুলি ছুড়লেন বটে, কিন্তু একটাও লাগল না। ততক্ষণে রণজয় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এর ঠিক এগারো দিন পরের ঘটনা। পশ্চিমবাংলার একটি গ্রামে এক বিধবা মহিলা উঠোনের তুলসীমঞ্চ সন্কেবেলা প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছিলেন, এমন সময় কাছ থেকে কে যেন ডেকে উঠল, মা!

তিনি চমকে উঠে চারদিকে তাকালেন, কিন্তু কারুকে দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন, তিনি ভুল শুনেছেন।

আবার কেউ ডাকল, মা!

মহিলা এবার বললেন, কে?

এবার কেউ গোয়াল ঘরের আড়াল থেকে বলল, মা, আমি তোমার ছেলে!

মহিলাটির বুখ ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। এ কি কোনও অপদেবতার খেলা? তাঁর ছেলে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। সে কি ফিরে এসেছে? তা হলে আড়ালে কেন? আর গলার আওয়াজটাই বা এত ভয়ংকর কেন?

কে তুমি সত্যি করে বলো তো?

মা, আমি সত্যিই তোমার ছেলে। আমার চেহারা বদলে গেছে। আমার গলার আওয়াজ বদলে গেছে। আমায় দেখলে সবাই ভয় পায় কিংবা মারতে আসে। মা, আমি তোমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি। তুমিও কি আমায় দেখে ভয় পাবে?

তুই সত্যিই আমার খোকা? তোকে দেখে আমি ভয় পাব কেন? তুই কোথায় চলে গিয়েছিলি?

সে অনেক কথা মা। তা হলে বলো, তুমি আমায় এখানে থাকতে দেবে? আমায় দেখে ভয় পাবে না?

মা কখনও ছেলেকে দেখে ভয় পায়? আয়, আমার কাছে আয়।

এবার উঠোনে পড়ল একটা বিরাট কালো ছায়া। তারপর গোয়ালঘরের পেছন থেকে বেরিয়ে এল একটি দৈত্যের মতন মানুষ। সে মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, মা আমি তোমার সেই রণজয়। আমাকে এখানে লুকিয়ে থাকতে দাও, আমি আর কোথাও যাব না!

গ্রামের একেবারে সিঁথে-সরল এক যুবক
রণজয় বিশ্বাসের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রহান্তরের দুষ্ট লোকদের
পাল্লায় পড়ে রূপান্তর ঘটল নীলবর্ণের মানবে।
নীল মানুষকে মুখ্য চরিত্রে এনে সুনীল লিখে
গেছেন একের পর এক কাহিনি। তার মধ্যে
যেমন আছে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ, গল্পের টান টান
রোমহর্ষতা, তেমনই সব কিছুকে ছাপিয়ে ফুটে
উঠেছে নিবিড় মানবিক আবেদন।



9 789350 403914